

জুন, ১৯৮৭

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর সৌন্দর্য়ের হৃষি
ইহুদী চক্রান্তের কবলে
মুসলিম উদ্বাহ

চির মুসলিম দুশ্মন ইবনে
সাবার উত্তরসূরী ইসমাই—
লিয়া আগাখানীদের
মুখোশ উন্মোচন



মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতা:

শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা

১৮ জ্যৈষ্ঠ-১৪০০

১০ জিলহজ্জ-১৪১৩

১ জুন -১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ

কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা:

উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ

মুফ্তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ

মনযুর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ

হাবিবুর রহমান খান

মুফ্তী শফিকুর রহমান

মূল্য : ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ

সম্পাদক জাগো মুজাহিদ

বি/৪৩৯, তালতলা,

খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

ফোনঃ ৮১৮০৩৯

অথবা

জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩

ঢাকা-১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম	২
* সম্পাদকীয়	৩
* হাদীসের আলোক হজ্জ ও ওমরার ফজিলত	৫
* ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ইন্দ্যযোগী আবু ইসলাম	৬
* ইয়াহুদী চক্রান্তের বলে মুসলিম উম্মাহ আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	৯
* ইসলামের চিরদুশমন ইসমাইলিয়া আগাখানীদের মুখোশ উম্মোচন	১০
মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন	১২
* মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?	১৩
ইবনে বতুতা	১৬
* আমার দেশের চালচিত্র মুহাম্মাদ ফারুক হসাইন খান	১৯
* কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল আল্লাহর সাহায্য আমি ব্রহ্মে দেখেছি	২৪
* ধারাবাহিক উপন্যাস মরণজয়ী মুজাহিদ	২৫
মন্ত্রিক আহমাদ সরওয়ার	২৭
* কবিতা	৩০
* প্রশ্নাত্ত্ব	৩১
* নবীন মুজাহিদদের পাতা	৩৫
* গঞ্জঃ একজন কিশোরী ও একটি ঝাশিনকৃত উম্মে মাইম	৩৭
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা	৩৯

পাঠকের কলাম

সব রকম বাতিল নিয়ৰ্লে জাতীয় এক্য চাই

শাইখুল হাদিস হ্যয়েত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে লং মার্চ বস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এতিহাসিক বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম নিধন বঙ্গের দাবীতে এই এতিহাসিক লং মার্চ আন্দোলন কর্মসূচী বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বমানবের বিবেক ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিয়ে সম্পূর্ণ সময়োচিত, বিজ্ঞ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় এবং বিশ্বের ১২৫ কোটি তৌহিদী জনতার মর্মগীড়া গভীর আবেগ ও অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। এর গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্বের সচেতন শান্তিপ্রিয় মানব গোষ্ঠীর নিকট অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে।

শুরুজ্জেয় শীর মাশায়েখ ও আলেম সমাজের নিকট বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখে তাদের নিজ নিজ অবস্থান কর্মকাণ্ড আত্মচেতনা ও আত্মগুর্জি সম্পর্কে এবং শত্রু বিভক্ত আত্মকলাহে লিঙ্গ অমানুষিক বর্বর নির্যাতনের শিকার মুসলিম মিল্লাতের অসহায় করুণ এ পরিগতির প্রতি লক্ষ্য করে সঠিক পথ ও পদ্ধতি নিজ নিজ দারিদ্র্য পালনে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্যে আমরা বিশ্বেতাবে আপনাদের অনুরোধ করছি।

বাতিলপ্রয়োগ ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী সমগ্রলো যদি আজ এক প্লাট ফরমে দৌড়িয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী চালাতে পারে, তারা যদি পারম্পরিক আকাশ পাতাল প্রভেদ, মত ও পার্থক্য ভূলে এক আওয়াজ উঠাতে পারে, তবে হে গাফেল-আতুকলহে লিঙ্গ মুসলিমান। তোমরা কেন এক কলেমা, এক কালাম, এক আল্লাহ ও রসূল (সঃ)- এর অনুসারী হয়ে আজ দুশ্মনদের হাতের ত্রীড়নক হয়ে আল্লাহ পাকের আজাবে ও গজবে হেফতার হয়ে সাহস্রিক জীবন যাপন করছো?

এখনো সময় আছে, তওবার দরজা খোলা আছে। আসুন নিজ কৃতকর্মের খেসারত, আত্ম চেতনা বোধ ও আত্মসংশোধনের পথ ধরে ইমান, আমল ও আখলাক দুরুত্ব করে বিশ্ব জোড়া ইসলাম ও মুসলিম উচ্চায় বিরস্তে ঘরে বাইরে অন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়

বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলি। প্রাচ্য ও প্রাচিন্যের সর্বশক্তির আধিক, সামাজিক ও অপসংকুতির গোলামীর জিজির মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে বসবাস করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক আমাদের সহায়।

এতিহাসিক বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও তারাতে সংখ্যালঘু মুসলমান নিধন বঙ্গের দাবীতে লং মার্চ কমিটি আহুত শাখো শাখো নিরীহ নিরুত্ত সুশৃঙ্খল পান্তিপূর্ণ তোহিদী জনতার মিহিলে বিনা উক্তানীতে পুলিশের বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করার তাষা আমাদের নেই। এই অমানুষিক নগ হামলায় শহীদদের আজ্ঞার মাগফেরাত ও শত শত শত নীরীহ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আমরা দলমত নির্বিশেষে বা সর্বস্তরের জনগণ আল্লাহ পাক রাখুল আলামিনের দরবারে সকান্দরে বিদ্রু হাদয়ে দোয়া এবং শোকসন্তুষ্ট পরিবার বর্ষের প্রতি সমবেদনা জাপন করছি।

এ সংগে নিহতদের পরিবার বর্গের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষী লোকদের দৃষ্টিমূল শান্তি প্রদানের জন্যে আমরা বর্তমান সরকারের নিকট জোর দাবী করছি। অন্যথায় এর ভয়াবহ পরিগতির জন্য বর্তমান সরকারের প্রশাসনই সম্পূর্ণ জনপে দায়ী থাকবে।

সভাপতি
ভৈরব অনৈমসলামিক কার্যকলাপ
প্রতিরোধ কমিটি,
পোঃ ভৈরব,
জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

এই ভীরুতার কারণ কি?

সুপ্রিয় সম্পাদক সাহেব!

দরদনভরা ভালবাসা জানাচ্ছি। ঘূর্মত জাতিকে জগত করাগে, যে কোন সম্পর্ক স্থাপনে, পরিচয় জানার ব্যাপারে সেখনিই উক্তম মাধ্যম। আপনাদের সাথে পরিচয় লাভের সুবৃন্দ সুযোগ করে দিয়েছে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা "মাসিক জাগো মুজাহিদ" তথা আপনাদের ক্ষুরধার লেখনি। আল্লাহর কাছে এজন শুরুরিয়া আদায় করছি।



বহু পত্রিকা দে খচি, পড়েছিও। কোনটাই আমাকে জীবনে আকৃষ্ট করতে পারে নি। আমার মন যা খুঁজেছে, আল্লাহ তাই-ই দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি চিরনিমই জেহানী মন। জাগো মুজাহিদ পত্রিকা আমার আশা পূর্ণ করেছে। এতে যারা লিখেন তারা পশ্চিম, তাদের পাশ্চিম প্রশংসন দাবী রাখে। জাতির পথ নির্দেশনায় জাগো মুজাহিদ পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

আপনাদের পত্রিকায় আমার একটি লেখা স্থান পেয়েছিল। আমি মূর্খ, ভাষা জ্ঞান কম। হৃদয়বান বলেই আপনারা আমার অবমৃলায়ন করেননি। এজন্য আমি ধন্য, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সারা বিশ্বের মুসলমানের আজ বিপর্যয়। বিপর্যয়ের ঘোকাবিলায় জেহানী মন সন্তান কোথায় পাব? কোন সূত্র ধরে আসবে? সেই বিচারই এখন বড়। সন্তান যে সব পাছিব বা আসছে, অধিকাংশ তোষামোদ প্রিয়, পদলোটী ও পরকীয়া বৃত্তি সম্পর্ক। মুসলিম এতিহাস তাদের মধ্যে নেই; তারা আতংকহৃষ্ট। জাতির রক্ষায় কাদের পাঠাবেন সমর ক্ষেত্রে? পরাগুরণে অভ্যন্ত আজকের মুসলমানদের কাছ থেকে একমাত্র মার খাওয়া ছাড়া কি আশা করা যায়? আফসোস!

এই ভীরুতার কারণ কি? কেন বীর ও বীরঙ্গন আজ তৈরী হচ্ছে না? কোন নীতির রমনী দরকার যার গত হতে বাওলার ন্যায় বীরঙ্গন জন্ম মেবে? নেবে শহীদ ক্ষাণীর আদুল রহমান ফারাকী (রঃ)- এর ন্যায়? শরীয়তের বিবর্তিত নারীর কাছ থেকে এটা কি আশাকরা যায়? জানী আপনারা, আপনারাই তেবে দেখবেন।

আজকের মেয়েদের নয়তা, রংচারিহীন আদর্শ অনুকরণের ফল যে শুভ নয় তা বলার অশেকা রাখেন। নারী স্বাধীনতার নামে চলছে বেহয়েদন। একে রোধ করার ব্যাপারে জিহাদী কলম চালাতে হবে। মাঠের জিহাদ, ঘরের জিহাদ দুইই দরকার। নারীদের বিশ্ব চলাফেরা আর ইসলামপন্থীদের তথা ইসলামের অপসমালোচনা সহ করা দায়। আপনাদের ন্যায় সঠিক পথ নির্দেশক পাওয়ায় এই বয়সে হৃদয়ে প্রেরণা জেগেছে। কলম ধরোছি।

প্রিসিপাল এ, এক, এম সাইমেন আহমদ খালেদ
লক্ষ্মীপাণ্ডি,
নড়াইল।

সম্পাদকীয়

ভাগ্য বিপর্যয়ের চূড়ান্ত লগ্নেও আমরা আশাহৃত নই

বিশে ৫০ টিরও বেশী স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র, বিপুল সংশ্দ ও সীমাহীন বিভিন্ন অধিকারী আরব দেশগুলা আর সোয়া'শ কোটি সদস্যের মুসলিম উদ্ধার বহুল তরীয়তে বিরাজমান থাকাবস্থায় গত ১৩টি মাস যাবত পূর্ব ইউরোপের (সাবেক সমাজতান্ত্রিক অধুনা সমাজতন্ত্র মুক্ত গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তন প্রয়াসী) মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়া যে পশু সুলভ কার্যকলাপ সংঘটিত হলো এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসের বুকে বসনিয়া একটি গভীর ক্ষত রূপে চিরদিন বেঁচে থাকবে। জুলে থাকবে মুসলিম জাতির ললাটে চিরস্থায়ী কলংক টিকা হয়ে।

কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে পাচাত্যের তথাকথিত সভ্য জাতিগুলো, অর্থডেক্স খ্রিস্টান সার্বরা, ইউরোপ ও আমেরিকার সকল শক্তির নীরব সমর্থনে জাতিসংঘের কৌশলগত পৃষ্ঠপোষকতায় বসনিয়ার দুই লক্ষ মুসলমানকে পৈশাচিক প্রতিয়ায় হত্যা করেছে। নির্মম নির্যাতন করে, জীবন্ত লাশে পরিগত করেছে ষাট লক্ষাধিক মুসলিম মা-বোন ও মেয়েকে। দশ লক্ষাধিক মুসলিম আবাল বৃক্ষ বণিতা এখন তাদের বাস্তু ভিটে হেড়ে স্নোতের শেওলার মতো বন্যার তোড়ে ভাসছে। অনেকেই সার্বীয় বন্দীশালার নিপীড়ন সেলে অপেক্ষা করছে “সুখের মরণ কবে আসবে”।

জাতিসংঘ নামক মুসলিম জাতির চরম দুশমন সংস্থাটির সর্বোচ্চ আসনটিতে অধিষ্ঠিত মিসরীয় আরব বংশোদ্ধৃত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক কিবতী খ্রিস্টান, কুখ্যাত কুটনীতিক বুটোস ঘালি পরম নিষ্ঠা আর কৌশলের সাথে ইউরোপকে মুসলিম শূন্য করার হীন চেষ্টায় রত। বসনীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীটিকে নির্বৎস করে দেয়ার পর হয়ত পাচিমা নেতারা বুটোস ঘালিকে শাস্তির জন্য নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করবেন।

গত ১৩/১৪ মাস যাবত বসনীয়দের সাহায্য করা, তাদের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, খুনী ও ধর্ষণকারী সার্বদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করা ও সার্বীয় সীমালংঘনের ব্যাপারে মার্কিন এবং মিত্রশক্তির হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে কেবল আলোচনা বৈঠক, প্রস্তাব আর প্রচারণাই হতে থাকলো। বিশের মানবাধিকার ও ন্যায়-নীতির ধ্বংসাধারীরা যেন অপেক্ষায় রয়েছেন; কোনদিন এ সংবাদটি আসবে যে, বসনিয়ায় আর কোন মুসলমান নেই। এর পরই তারা সেখানে মানবাধিকার ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য সে সময়টি ঘনিয়ে এসেছে। একে একে প্রায় সব ক'টি বসনিয় প্রধান শহর সার্বদের হাতে চলে গেছে। আর দু' একটা জায়গার পতন হলে সব বামেলা চুকে যাবে।

ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ বিচ্ছুত, ইমানী শক্তি হারা, বিলাসী, ইন্দুরণ্য ও পাচাত্যের সেবাদাস মুসলিম নেতৃবর্গের মোটা চামড়ায় বসনিয়া ট্রাইজেডী দাগ কাটতে না পারলেও মুসলিম উদ্ধার নিরীহ সদস্য আর সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এঁকে দিয়েছে বিশাল ক্ষতের আয়োজ উকি। এই রক্তান্ত দ্বা সহজে শুকানোর নয়।

আমাদের জানা নেই, পূর্ব ইউরোপে অনুষ্ঠিত ইমানের এই অয়ি পরীক্ষার ফলাফল কী ধরণের বারতা নিয়ে মুসলিম জাতির উপর ফিরে আসবে। খৎস, পতন, শাস্তি ও আয়াবের বাণী নিয়ে? নাকি পুনরুদ্ধান, শক্তি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশ্বাস বহন করে? কারণ ইতাশা ও নৈরাশ্য ইমানের বিপরীত জিনিস। অন্ততঃ শেষনবী (সা:)—এর উচ্চতের দাবী নিয়ে হলেও আমাদের আশাবাদী হতে হবে। কেননা আল্লাহর রহমত আমাদের সকল অপারগতা, উদাসীন্য ও অপরাধের চেয়ে অনেক অনেক ব্যাপক।

‘জাগো মুজাহিদ’—এর নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ★ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ★ এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- ★ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- ★ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ★ অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ★ ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

২. বার্ষিক গ্রাহক টাঁদা (রেজিস্ট্রি ডাক)

★ বাংলাদেশ	একশো চাল্লিশ টাকা
★ ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
★ পাকিস্তান	আট ডলার
★ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
★ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
★ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার
সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।	

৩. গ্রাহক টাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ★ গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক ‘মাসিক জাগো মুজাহিদ’ নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়

ব্যাংক একাউন্ট

মাসিক জাগো মুজাহিদ
কারেন্ট একাউন্ট নং-৫৩১৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
লোকাল ব্রাঞ্চ, মতিঝিল, ঢাকা

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

ହାଦୀସେର ଆଲୋକେ ହଜ୍ର ଓ ଓମରାର ଫର୍ଜିଲ୍ଲତ

ହଜ୍ର କାର ଓପର ଫରଜଃ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରାଃ) ଏର ବର୍ଣନା, ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) ବଲେନ, 'ଯାର କାହେ ହଜେ ସଫର କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପାଥେୟ ଆହେ ଏବଂ ବାୟତୁଲ୍ଲାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛାତେ ପାରେ ଏମନ ଯାନବାହନେରେ ବ୍ୟବସ୍ତା ଆହେ, ସେ ସଦି ହଜ୍ର ନା କରେ ତବେ ତାର ଇହନୀ ହ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରା ଓ ଖୁଷ୍ଟାନ ହ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ତଫାହ ନେଇ। କାରଣ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଏରଶାଦ କରେଛେନଃ "ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ବାୟତୁଲ୍ଲାହର ହଜ୍ର ଫରଜ ତାଦେର ଓପର ଯାରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଓଯାର ସାମର୍ଥ ରାଖେ।" (ତିରମିଯି, ମା'ଆରେଫ)

ଓମରାର ସ୍ଵର୍ଗପଃ ହଜ୍ରେର ମତି ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଏବାଦତ ହଲ ଓମରାହ। ଏଟା ମୂଳରେ ମୁୟାକ୍ଷାଦାହ। ଏର ବ୍ୟବପ ହଜେର କତକ ପ୍ରେମିକ ସୂଳତ କ୍ରିୟାକର୍ମ। ତାଇ ଏକେ ହଜ୍ରେ ଆସଗର (ଛୋଟ ହଜ୍ର) ବଳା ହ୍ୟେ।

ହଜ୍ର ଓ ଓମରାର ଫର୍ଜିଲ୍ଲତଃ ହ୍ୟରତ ଆଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ମାସୁଉଦ (ରାଃ) ବର୍ଣନା କରେନ, ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) ବଲେନ, 'ହଜ୍ର ଓ ଓମରା ଏକମାଥେ କର। ଉତ୍ତଯ ଏବାଦତ ଦାରିଦ୍ର ଓ ଗୋନାହକେ ଏମନଭାବେ ଦୂର କରେ, ଯେମନ କର୍ମକାର ଓ ସ୍ଵର୍ଗକାରେର ଗରମ ପାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଲୋହା ଓ ମୋନାର୍କପାର ଆବର୍ଜନା ଦୂର କରେ ଦେଇ। ଆର ହଜ୍ରେ ମାବରମ୍ ତଥା ମକବୁଲ ହଜ୍ରେର ପ୍ରତିଦାନ ଓ ଛୁଟ୍ୟାବ ତୋ ଜାଗାତିଇ।" (ତିରମିଯି, ନାସାଯି, ମା'ଆରେଫ)

ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏରଶାଦ କରେଛେ, 'ହଜ୍ର ଓ ଓମରାର ଜନ୍ୟେ ଗମନକାରୀ କ୍ଷତି ଆଲ୍ଲାହର ବିଶେଷ ମେହମାନ। ସେ ଦୋଯା କରଲେ ଆଲ୍ଲାହ କବୁଲ କରେନ, କ୍ଷମା ଚାଇଲେ କ୍ଷମା କରେନ।" (ତିବରାନୀ, ମା'ଆରେଫ)

ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଆରଓ ବଲେନ,

"ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ପ୍ରତିହ ତୌର ହାଜୀ ବାନ୍ଦାଦେର ଜନ୍ୟେ ୧୨୦ଟି ରହମତ ନାଜିଲ କରେନ। ତନ୍ମଧ୍ୟେ ୬୦ଟି ରହମତ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯାରା ବାୟତୁଲ୍ଲାହର ତେଓଫକ କରେ, ୪୦ଟି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯାରା ମେଖାନେ ନାମାଜ ପଡ଼େ ଏବଂ ୨୦ଟି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯାରା କେବଳ କାବାକେ ଦେଖିତେ ଥାକେ।" (ବାୟହାକୀ)

ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଦୀସେ ଆରଓ ବଳା ହ୍ୟେଛେ ଯେ, "ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ୫୦ ବାର ବାୟତୁଲ୍ଲାହର ତେଓଫକରେ ନେଇ, ସେ ଗୋନାହ ଥେକେ ଏମନ ପାକ ହ୍ୟେ ଯାଏ, ଯେଣ ଆଜଇ ଭୂମିଷ୍ଟ ହ୍ୟେଛେ।" (ତିରମିଯି)

ଏକ ଦୀର୍ଘ ରେଓୟାଯେତେ ହ୍ୟରତ ଯାବେର (ରାଃ) ବର୍ଣନା କରେନଃ ରାସୁଲ (ସାଃ) ବଲେନ, "ଆରାଫାର ଦିନେ ଯଥନ ହାଜିଗଣ ଆରାଫାତେର ମୟଦାନେ ଏକତ୍ରିତ ହ୍ୟ, ତଥନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଫେରେଶତାଦେରକେ ଗର୍ଭ କରେ ବଲେନ, ଆମାର ବାନ୍ଦାଦେରକେ ଦେଖ, ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତ ଥେକେ ତାରା ଆମାର କାହେ ଏସେଛେ। ତାଦେର କେଶ ବିକ୍ଷିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦେହ ଧୂଲି ଧୂସରିତ, ତାରା ବୌଦ୍ଧର ମଧ୍ୟେ ଚଳାଫେରା କରିଛେ ତୋମରା ସାକ୍ଷୀ ଥେକ, ଆମି ତାଦେର କ୍ଷମା କରିଲାମ।" (ବାୟହାକୀ, ଇବନେ ଖୁଯାମା)

ହ୍ୟରତ ବିବି ଉମ୍ମେ ଛାଲମା (ରାଃ) ବଲେନଃ ଆମି ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ)କେ ବଲତେ ଶୁଣେଇ, "ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାୟତୁଲ ମାକଦାହ ହତେ (ମକାର) ବାୟତୁଲ ହାରାମେର ଦିକେ ହଜ୍ର ବା ଉମରାହର ଏହରାମ ବୌଧିବେ ତାର ପୂର୍ବାପରେର ଗୋନାହ ମାଫ କରା ହେବ ଅଥବା ତିନି ବଲଣେଃ ତାହାର ଜନ୍ୟ ଜାଗାତ ଓୟାଜିବ ହେବେ।" (ଆବୁ ଦ୍ୱାଉଦ, ଇବନୁ ମାଜା)

ହ୍ୟରତ ଇବନେ ମାସୁଉଦ (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, "ହଜ୍ର ଓ ଉମରା

ମାଥେ ମାଥେ କର। କେବଳ ତା ଦାରିଦ୍ର ଓ ଗୋନାହ ଦୂର କରେ ଯେତାବେ ହାପର ଲୋହ ଏବଂ ମୋନାର୍କପାର ମୟଲା ଦୂର କରେ କବୁଲ କରା ହେବେ ଛୁଟ୍ୟାବ ଜାଗାତ ବ୍ୟତୀତ କିଛୁଟି ନୟ। (ତିରମିଯି ଓ ନାସାଯି)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ବଲେନ, "ଏକଦା ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) କେ ଜିଜାସା କରା ହୁଲଃ କୋନ୍ ଆମଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତିନି ବଲଣେନ, "ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତାର ରାସୁଲେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ରାଖିବା" ଅତପର ଜିଜାସା କରା ହୁଲ, ତାର ପର କି? ତିନି ବଲଣେନ, "ଆଲ୍ଲାହର ରାତ୍ତୀଯ ଜିହାଦ କରା।" ପୂନରାୟ ଜିଜାସା କରା ହୁଲଃ ତାର ପର କି? ତିନି ଉତ୍ତରେ ବଲଣେନ, "କବୁଲ କରା ହଜ୍ର!" (ତିରମିଯି)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, "ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ହଜ୍ର କରିଛେ ଏବଂ ତାତେ ଅଶ୍ଲୀଲ କଥା ବଲେନି ବା ଅଶ୍ଲୀଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି ମେ ହଜ୍ର ହତେ ଫିରିବେ ସେଇ ଦିନେର ନ୍ୟାୟ ଯେଦିନ ତାର ମା ତାକେ ପ୍ରସବ କରିଛେ।" (ତିରମିଯି)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ବଲେନ, ଆମି ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) କେ ବଲତେ ଶୁଣେଇ, "ଆଲ୍ଲାହର ଯାତ୍ରୀ ହୁଲ ତିନ ବ୍ୟକ୍ତି; ହାଜୀ, ଗାଜୀ ଓ ଉମରାହକାରୀ। (ନାସାଯି, ବାୟହାକୀ, ତିରମିଯି)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁହାହ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, "ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜ୍ର, ଉମରା ଅଥବା ଆଲ୍ଲାହର ରାତ୍ତୀଯ ଜିହାଦେର ନିଯମେ ବାହିର ହ୍ୟେଛେ ଅତଃପର ଐ ପଥେ ମାରା ଗିଯେଛେ ତାର ଜନ୍ୟ ଗାଜୀ, ହାଜୀ ବା ଉମରାକାରୀର ସମ୍ବ୍ୟାବ ମେଖା ହ୍ୟେବ।" (ବାୟହାକୀ, ତିରମିଯି)

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মুদ্য়যোগ

আবু ইসলাম

আল্লাহর ইচ্ছার সামনে ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণের স্তুতি বিজড়িত কোরবানীর উদ্দেশ্যাপিত হয় বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে। কোরবত শব্দ থেকে কোরবানী। কোরবত অর্থ নৈকট্য। পশু জবেহের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য দাতের চেষ্টা করা হয় বলেই একে কোরবানী বলা হয়। আল্লাহর নির্দেশকে ইবরাহীম (আঃ) অধিক গুরুত্ব দেন না তাঁর কাছে নিজের সন্তানের মতাতই বড়, এ পরীক্ষা নেয়ার জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর নামে জবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) সেই ইমানী পরীক্ষায় যথাযথ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুত্রের গলায় চালিয়েছিলেন ধারালো ছুরি।

আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ইবরাহীমের প্রাণধিক প্রিয় পুত্রকে বধ করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়—তিনি ইবরাহীম (আঃ) থেকে যা চেয়েছিলেন, তা পেয়ে গেছেন। তাই ধারালো ছুরির কর্তন—শক্তি তিনি রাহিত করে দিলেন! ছুরি ইসমাইলের একটি পশমও কাটলো না। হ্যরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, তোমার ইমানের পরীক্ষা হয়ে গেছে—তুমি সফল। তুমি ইমানী দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছ।

তবে মানব ইতিহাসে আল্লাহর এহেন একটি কঠোর নির্দেশ পালনের এত বড় ত্যাগের ঘটনা এতাবে কালের স্মৃতে ভেসে যাবে, এটা আল্লাহ চাননি। তিনি এ ঘটনাকে পরবর্তীদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রেরণা হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যাতে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্যে ত্যাগের এ

ঘটনাকে অনুপ্রেক করে রাখলেন। এর বিকল হিসাবে প্রতীকী ব্যবস্থা স্বরূপ পশু কোরবানীর নির্দেশ দিলেন। এখন পুত্র নয়—পশু কোরবানীর মধ্য দিয়ে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাইলের (আঃ) ত্যাগের শিক্ষাকে অরণ করে কেউ নিজ জীবন ও চরিত্রকে আল্লাহর অনুগত করে গড়ে তুলতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের দ্বারা তাঁর জন্যে উন্নত। তা না করে শুধু গোশ্চত খাবার ইচ্ছা কিংবা আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা স্টো অর্জন সম্ভব হবে না।

কোরবানীর মূল ইতিহাস সৃষ্টিকারী হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)—এর ইমানী দৃঢ়তা ও সংগ্রামী ভূমিকা যেন কোরবানীদাতা ভূলে না যায়, সে জন্যে পবিত্র কুরআনে ঘ্যথহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, “তোমরা ইবরাহীমের গোটা সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিমন্ত্র করো। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি যে ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও ন্যায়ের ওপর অটল থেকেছেন, তোমাদেরও একই ভূমিকা নিতে হবে।

কোরবানীর পশু মোটা—তাঁজ ও সুদর্শন হওয়া উচিত। হাদীসে এর মাধ্যমে পুলসিরাত পার হবার যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি হ্যত রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ কোরবানীর অনুষ্ঠান থেকে লক্ষ শিক্ষা ও সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সহজ পদ্ধতি পুলসিরাত পার হবার ব্যবস্থা হবে। কোরবানীর ক্ষেত্রে অধিক মূল্যের পশু হওয়া ইত্যাদি কিছুর মধ্য দিয়ে আসলে বিষয়টির প্রতি কোরবানীদাতার হৃদয়ে গুরুত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যাদের

কোরবানীর পশু হোট যেমন কেউ খাসি কোরবানী দিয়েছে, তাহলে কি তার ওপর গরু কোরবানীদাতারা অধিক প্রেরণের অধিকার হয়ে গেল? আর যদি ঐ পশুই পুলসিরাত পার হবার বাহন হবে, তাহলে একটির উপর সাত শরীকদার সঙ্গয়ার হবার স্থান কোথায়? এ ছাড়া যাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়, তাহলে তাদের পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যাবার উপায় কি? আসল কথা হচ্ছে তাই যা ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হলো। আল্লাহতায়ালা কাছে পশুটিই যে বড় কথা নয়, তার বড় প্রমাণ হলো তিনি ঘোষণা করেছেন, ‘আল্লাহর কাছে কোরবানীর গোশত রক্ত কিছুই পৌছুবে না—পৌছুবে শুধু কোরবানী থেকে লক্ষ তাকওয়া’ অর্থাৎ তাকওয়ামণ্ডিত চরিত্রের কর্মফল।” (সুরা হাজ্জ)

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্তার ফলেই ইবরাহীম (আঃ) অযিকুণে নিক্ষেপের সময় গায়রম্ভাহুর সাহায্য সাত করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ত্বে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ সকল কিছুর স্টো হিসাবে সর্বশক্তিমান। কাজেই স্টোর ইচ্ছা না হলে স্টোট নমরণদের অযিকুণের আগুনও দাহন শক্তিহীন হতে বাধ্য। বস্তুতঃ নমরণদের অযিকুণ নাতিশীতোক্ষে পরিণত হবার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই বাস্তব ফলক্ষণতি মিসেছে। আজ এ দিনেও ইমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং দ্বিনের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছুতে হলে একজন মুমিনকে যেমন অনুরূপ ইমানী দৃঢ়ত্বার শক্তিশালী হতে হবে, তেমনি হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মতো বাতিল ও তাগুত্তি শক্তির বিরুদ্ধে হতে হবে আপোষাধীন।

হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) মানব মনের

দুর্বলতার উৎস শির্ক তথা গায়রস্থাহুর শক্তিমত্তার উপর মানুষের আস্থার মূলে কৃষ্ণারাধাত হেনেছিল এবং এই শক্তির মূল আধার আল্লাহুর ওয়াহদানিয়াতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজ সমাজে। কারণ আল্লাহুর ওয়াহদানিয়াতের উপর আস্থাই মানুষকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করতে পারে এবং মানব সমাজের তঙ্গিদী এক্যই আনতে পারে শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বস্তুতঃ হয়রত ইবরাহীম (আঃ) এভাবেই চেয়েছিলেন ইরাককে কেন্দ্র করে আল্লাহুর জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা একটি সুখী-সুস্মর, শোষণযুক্ত আল্লাহতুক্ত সমাজ গঠন করতে, আর তৎকালীন ইরাক অধিপতি নমরাদ তারই বিরোধিতায় খড়গস্ত হয়ে উঠে। তাই মহাত্যাগী নবীর স্মৃতিবিজড়িত কোরবানী হয়রত ইবরাহীমের আদর্শের যথার্থ অনুসরন ছাড়া কিছুতেই সফলতা বয়ে আনতে পারে না। প্রতি বছর কোরবানী উপলক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষ পশু কোরবানী করা সত্ত্বেও কোরবানীর সেই স্বীকৃত সক্ষ্য অর্জিত না হবার মূল কারণ এখানেই নিহিত।

যুগ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এ জগতে মানব সমাজে আল্লাহুর বহু প্রেরিত পুরুষ অতীত হয়ে গেছেন। তাদের কারুর উপরই মানবজাতির পরিপূর্ণ বিধান অবরুণ হয়নি। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-ই এ সৌভাগ্য পাও করেন। আল্লাহুর এই পরিপূর্ণ বিধান মানব সমাজে কার্যকর ও প্রয়োগ একটি কষ্ট ও সংগ্রাম সাধ্য কাজ। এ কাজে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি জুনুম, নিপীড়ন। এজন্যে প্রয়োজন রয়েছে মন্তব্ধ ত্যাগের। বস্তুতঃ এ কারণেই অপর কোন নবীর বিশেষ কোনো আদর্শকে উপরে মুহাম্মদীর উপর পালনীয় না করে হয়রত ইবরাহীমের মহাত্যাগের আদর্শ অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ জানেন, আল্লাহ পরিপূর্ণ জীবন বিধান মানব সমাজের

প্রতিষ্ঠার দুরহ ও কষ্টসাধ্য কাজটিতে ১৮ম ইমানী পরীক্ষার মুহূর্তে একমাত্র ইবরাহীমী ত্যাগের স্মৃতিই উচ্চতে মুহাম্মদীর খণ্ড বড় পাথেয় হতে পারে। আমাদের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব-মানববগোষ্ঠী আজ অশাস্তির কবলে নিপত্তি। সর্বত্রই প্রত্যেক ও পরোক্ষ মানব সমাজের উপর নমরাদী মনোবৃত্তির প্রভৃতি চলছে, যদ্রূপেন মানুষ শাজ অন্যায়-অবিচার শোষণ-নিপীড়নের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। মানবতাকে এ দুর্বিসহ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে প্রতিটি ইমানদার কোরবানীদাতার ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনী চেতনা ও ত্যাগের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য। মুমিন-আত্মার ইমানী শক্তির নতুন উদ্বোধন ঘটাবার জন্যে কোরবানী অনুষ্ঠান প্রতি বছর আমাদেরকে এই আহবানই জনিয়ে যায়।

বস্তুতঃ নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত, কষ্টার্জিত সম্পদ ও প্রাণধিক প্রিয় বস্তুকে আল্লাহুর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে সমর্পণের উদার আহবান নিয়েই প্রতি বছর কোরবানীর ইদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কোরবানী একদিকে যেমন ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী; মহান নবী ইবরাহীম (আঃ)-এর ত্যাগদীপ্তি সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেয়, তেমনি প্রতিটি মুমিন অঙ্গরকে ইমানী চেতনায় করে তোলে উজ্জ্বলিত। ইন্দুল আয়হার দিনে কোরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালাবার পূর্বাহে কোরবানীদাতা যখন উচ্চারণ করেন;

“আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার বেঁচে থাকা, মৃত্যু বরণ সব কিছু বিশ্ব-প্রতিপালকের জন্যে”-এ কথার দ্বারা একজন কোরবানীদাতা মূলতঃ নতুন করে আল্লাহুর সাথে এই অঙ্গিকারেই আবদ্ধ হয় যে, হে খোদা! হয়রত ইবরাহীম (আঃ) মেতাবে পারিবারিক, সামাজিক, আধিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার বাধাবিপত্তি, অমানুসিক জুনুম-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে তোমার

নির্দেশের উপর অটল ছিলেন এবং বাতিলের সাথে আপোষ না করে সামাজিক বয়কট ও রাষ্ট্রীয় চরম দণ্ড অযিকুণে পর্যন্ত নিষ্কিষ্ট হয়ে নিজের জীবনকে নির্মম মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে ইত্তেক্ষণঃ করেননি, আমিও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহুর বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করতে দ্রুতপ্রতিজ্ঞ। এজন্যে যদি আমাকে তাঁর মতো দেশাস্তরিত হতে হয় তাও রাজি আর যদি রাষ্ট্রীয় রোষাগলে পড়ে জেল-জুনুম এমনকি নির্মম প্রাণদণ্ডাদেশের ন্যায় চরম নির্দেশও শুনতে হয়, সেজন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এছাড়া আমার যেই প্রিয়তম সস্তান আমি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি, তোমার নির্দেশকে সকল কিছুর উপর তুলে ধরতে গিয়ে যদি তারও প্রাণ নাশ বা প্রাণহারার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্বৃত্ত হয়, সে অবস্থাকেও আমি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। তেমনিভাবে তোমার পথে চলতে গিয়ে যদি প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মতো পরিস্থিতির উদ্বৃত্ত ঘটে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা কোনো স্বামীই মেনে নিতে রাজি নয়, আমি অনুরূপ পরিস্থিতিতেও তোমার দীনের স্বর্ধে রিষ্টিচিন্তে তা করে যাবো।

বলাবছল্য, প্রতি বছর কোরবানী অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে কোটি কোটি পশু যবেহর যদি এটাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহুর নির্দেশকে সকল কিছুর উপর বলবৎকরার জন্যে মুমিন অঙ্গে নতুন প্রেরণা সংঘারের জন্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়, তা হলে এ মহান লক্ষ্য আমাদের সমাজে কতদূর পালিত হচ্ছে? কোরবানী অনুষ্ঠানের এদিনে প্রতিটি কোরবানীদাতাকে সেই আত্মজ্ঞানায় প্রবৃত্ত হতে হবে। অন্যথায় এই কোরবানী আপন আত্মায় ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুধু গোশতে ভক্ষণেরই একটি উৎসবে জুনপ্রাপ্তিরিত হবে।

হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহু তায়ালা যেই উক্ত মর্যাদায় সমাসীন করেছেন, তার স্বাভাবিক দর্শী হলো, হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং তাঁর জীবনের শিক্ষা আদর্শকে নিজেদের চলার পথের মশালে পরিণত করা। আল্লাহু তায়ালা এ জন্যেই হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর সত্যের উপর আপোষাইন দৃঢ়তা ও অটেল ভূমিকার প্রশংসা করার সাথে সাথে বলেছেন, “ঘোষণা করে দাও আল্লাহু যা বলেছেন যথার্থেই বলেছেন। তোমাদের উচিত নির্ধারণ ইবরাহীমের পথা অনুসরণ করা আর ইবরাহীম শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” - (আলে-ইমরান)

এখানে আল্লাহু তায়ালা হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) “হানীফ”, অর্থ-তিনি আল্লাহর প্রভুত্বে ছিলেন দিখাইন এবং তাঁর দাসত্ব পালনে ছিলেন একাগ্রচিন্ত। ইবরাহীম (আঃ)-এর গোটা জীবনই এ কথার সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহর খাতিরে গোটা সমাজ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই নিজ পিতাকে ত্যাগ করেছেন। নিজ সমাজকে ছেড়েছেন। আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়েই তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে নিজের বাড়ির, আরাম-আয়েশ। আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যেই তাকে নিজ জন্মভূমি ইরাকের ‘উর’ থেকে ফিলিস্তিনে, মিসরে এবং হেজাজে যেতে হয়েছে। যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো নিজের পিয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হলেন। মূলত তিনি তো তাঁর ইচ্ছামত পুত্র ইসমাইলকে যবেহ করেই ফেলেছিলেন, এটা আলাদা কথা যে, আল্লাহু নিজ অনুগ্রহে তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর খাতিরেই তিনি আপন স্তু এবং দুঃখপোষ্য শিশুকে নির্ভন্ব বাস দিয়ে এসেছেন। এক কথায় এমন কোনো ত্যাগ

কোরবানী তিনি বাকি রাখেননি যা আল্লাহর জন্যে নিবেদন করেননি।

(২) তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো এই যে, জীবনের কোনো পর্যায়ে এমনকি মহাসংকটের মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর প্রতি আল্লাহ দ্বিধাত্ত হননি। আল্লাহর নির্দেশ পালনে যেমন তাঁর কোন ধিধা-সংশয় ছিল না, তেমনি আল্লাহকেই তিনি মনে করতেন সর্বশক্তির আধার এবং একমাত্র মুক্তিদাতা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সক্ষয়। বস্তুতঃ আল্লাহু তাঁর প্রতিটি মুমিন বান্দার মধ্যে সেই ইবরাহীমী শুণাবণী ও ইমানী দৃঢ়তাই দেখতে চান। একারণেই মহাত্মাগী ইবরাহীম (আঃ)-এর সংগ্রাম জীবনের অনুসরণ করার জন্যে তিনি সূরা আলে-ইমরানের উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সকলকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই আহবানে কতদূর সারা দিছি? প্রতি বছর কোরবানী আসে কোরবানী যায়, আমাদের ব্যক্তি সমাজ ও সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহর জীবনে তার কি প্রতিফলন ঘটছে।

পদে পদে আজ আমরা আপন প্রবৃত্তির পূজা করে যাচ্ছি। ন্যায়, অন্যায়, হালাল, হারাম, হক না হক-কোনো কিছুরই আমাদের মধ্যে আজ তমিয় নেই। একদিকে দুনীতি, অসাধুতা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে, অপর দিকে আমরা প্রকাশ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসৃত নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধাচারণ করছি। সামাজ্য অর্থ, সামাজ্য জরিম, সামাজ্য পদমর্যাদা ও খতির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বাতিলের সাথে আপোষ করা, অসত্যের আশ্রয় নেয়া, অসত্যের কাছে মাথা নত করা আমাদের স্বত্বাবে পরিণত হয়ে গেছে। মুমিন সূলভ দৃঢ়তা ও সৎসাহস হারিয়ে গেছে। সত্য পথ, সত্য মত ও সত্য কথনকে মনে করা হচ্ছে জীবন উন্নয়নের অন্তরায়। চাতুর্য, অসাধুতা, কথাকর্মের বৈপরীত্য ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক চিন্তা আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে এনে দাঁড়

করিয়েছে যে, আমরা এখন প্রায় সব কিছু বৈষম্যিক স্বার্থের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছি। ফলে ন্যায়নীতি বিদ্যায় নিয়েছে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনের অবস্থাও ইবরাহীমী শিক্ষার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ অবর্ণনীয়। গোটা উম্মতের মধ্যেই যেন এক ঘুণে ধরা অবস্থা বিরাজমান।

বলা বাহ্য, এভাবে কোনো উম্মতের মধ্যে যখন সামগ্রিকভাবে ইমানী দৃঢ়তা সম্পন্ন পোকের অভাব দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে এক দিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পারম্পরিক হানাহনির সূত্রপাত ঘটে, অপরদিকে দুনিয়ার বাতিলপন্থী নমরাদদেরও দৌরাত্ম বেড়ে যায়।

মুসলিম সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ইতিহাসের ঠিক এমন এক যুগসম্মিলিত মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহু তায়ালা মুসলমানদের ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রায় একই অবস্থান, বিধান ছাড়াও তাদেরকে দান করেছেন প্রাকৃতিক বহু সম্পদ। তারা ইবরাহীমী ইমান বলে বল্লীয়ান হয়ে নিজ নিজ দেশ থেকে নমরানী বিধিবিধান, ধ্যান-ধারণার উৎখাত করে যদি খোদায়ী ন্যায়-বিধান প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে যেমন নিজেদের মধ্যে এত সব আত্মকলহ থাকত না, তেমনি বিজাতীয় কোন নমরানী শক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বোসনিয়া বা কাশ্মীর কোথাও নিজেদের দস্ত নথরাঘাতে মুসলিম জনপদকে ক্ষতিবিক্ষত করতে সাহসী হতো না। মৃত্যুর ডয়ে ইমানী দৃঢ়ত্বায় আড়ষ্ট মুসলমান আজ যেমন সকল দিক থেকে নিজের বাসভূমিতে অসহায় বোধ করে, তেমনি নমরানী বহিঃশত্রুর ডয়ে তারা শংকাগ্রস্ত। আল্লাহু না করুন, এ অবস্থা আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে মুসলমানদের নিজ ভূমিতে অবস্থানও কঠিন হয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

আমরা যে মুহূর্তে প্রতি বছর পশুর গলে ছুরি চালিয়ে ইন্দুল আয়হার কোরবানী
(২৩ পৃঃ দেখুন)

ইহুদী চক্রান্তের কবলে মুসলিম উম্মাক

আবদুল্লাহ আল-ফারক

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যায় যে, ইসলামের উত্থানের পর থেকেই মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদী চক্রের যে অব্যাহত চক্রান্ত চলে আসছে তা' ব্যাপকভাবে ও কার্যকরভাবে শুরু হয় ইসলামের তৃতীয় খলিফা হয়রত ওসমান (রা)- এর সময় থেকে। এর পূর্বেও হয়রত মুহাম্মদ (সা): মদীনায় হিয়রত করলে ইহুদীরা ইর্যাপরায়ণ হয়ে মুসল-মানদের মদীনা থেকে উৎখাত করার জন্য মকার কুরাইশদের সাথে গোপনে জেটিবন্ধ হয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সা):- এর দূরদৃশিতার ফলে তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে তাদের মদীনা থেকে বহিকার করে দেয়া হয়। বিস্তৃত হওয়ার পর ইহুদীরা বার বার রাসূল (সা): ও সাহাবীদের ধ্বংস করার চক্রান্তে মেতে থাকে। তাদের সেই চক্রান্ত ধ্বংসাত্মক রূপে নিয়ে প্রথম বারের মত মুসলিম উম্মাহর বুকে আঘাত হেনেছে তৃতীয় খলিফার খেলাফতের সময়ে। ইহুদীদের চক্রান্তের ফলে খলিফা শাহাদাত বরণ করেন, পরবর্তিতে আত্মাতা ও রক্তক্ষয়ী জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্ফিন সংঘটিত হয়েছে। ইহুদী চক্রান্তের জের ধরেই বিশ্ব বুকে সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক-কারবালাটাজেটী- ইমাম হোসাইন (রা:)- এর শাহাদাতের হৃদয় বিদ্রোক ঘটনা। এই ইহুদী চক্রের নায়ক ছিলো ইয়ামেনের ইহুদী বংশোদ্ধৃত নও মুসলিম ছদ্মবেশী ইহুদী পশ্চিম আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এই ইহুদী কৃতকী মুসলিমানের ছদ্মবেশে মুসলিম সমাজে ভাগ্ন ও বিরোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার আমলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার দূর্তাৰ্যী ও শীঁ চরিত্রের জন্য তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি।

তৃতীয় খলিফার সময় এই লোকটি অতীতের সকল চারিত্বিক দোষ সংশোধন করেছে এমন ভাবে করায় খলিফা সরল বিশ্বাসে তাকে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দেন।

ইবনে সাবার চক্রান্তের ফলে ও তার সুস্থ প্রচারণার কারণে মুসলিম সমাজে আন্ত আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টি হয় শিয়া সম্পদায়। ১৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশরে ফাতেমীয় শিয়া রাজবংশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পেছনেও রয়েছে সুস্থ ইহুদী চক্রান্ত। খৃষ্টান ধর্মকে বিকৃত করে "ত্রিতুবাদ" কায়েম করার পেছনেও রয়েছে ইহুদীদের অবিশ্বাসীয় (।) অবদান। প্রতিহিসার বশবতী হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা):- এর লাখ মুবারক চুরি করে অর্মানীদা করার এক দুঃসাহসিক ব্যর্থ চক্রান্ত করেছিল পাচাত্যের এই ইহুদীরাই। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক বিপর্যে এই ইহুদীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে ওই সেই থেকে।

ইসা (আ:)- কে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টার জন্যও দায়ী এই ইহুদীরাই। এ কারণে পাচাত্যের খৃষ্টান যুব সমাজ কর্তৃক যুগে যুগে নির্মূল-যজ্ঞ কাণ্ডের শিকার হয়েছে। কথিত যিশু হত্যার প্রতিশোধ ব্রহ্মপ খৃষ্টান বিশ্ব যুগ যুগ ধরে ইহুদীদের অসিতে গলিতে, রাস্তায়, বস্তিতে যেখানে পেয়েছে হত্যা করেছে। যিশু হত্যার প্রতিশোধ, মজ্জাগত শঠতা ও ধূর্তামী স্বত্বাব ও কুচকু জাতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় খৃষ্ট পৃঃ ৫৮৭ সালে বখত নছর বাদশাহ জেরজালেমের ইহুদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেন। ৭০ খৃঃ রোমানরা একই কারণে ইহুদী নিধনে ব্রত হয়। উল্লেখিত ত্রিবিধ কারণ ছাড়াও ইউরোপ মহাদেশের ইংল্যাণ্ড থেকে ১২৯০ সালে, ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম, ১৩০৬ ও

১৩৯৪ সালে দুই পর্যায়ে ফ্রান্স থেকে, ১৩৮০ সালে পূর্বের যুক্ত চেকোস্লাভার্কিয়া, ১৪৪৪ সালে ইল্যাণ্ড, ১৫৪০ সালে ইতালী, ১৫১০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৫১১ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ত কালে হিটলার কর্তৃক জার্মানী থেকে ইহুদী সম্পদায়কে বহিকার করা হয়।

এভাবে কৃতকী ইহুদী সম্পদায় তাদের কার্যকলাপের জন্য বিশ্বের সকল জাতি কর্তৃক বিতাড়িত, নির্যাতিত, নিরীড়িন ও গণহত্যার মুখোমুখি হলেও ইউরোপের মুসলিম শ্বেন ও তুর্কী সুলতানদের উদারতার কারণে তারা এই রাষ্ট্র দুঃঠিতে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ই পায়নি সম্মানীত বড় বড় পদেও অধিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যুগে যেমনি ইসরাইল তথা ইহুদীরা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার আঘাতে থেকে বিশ্বময় মানবতা বিশ্ববৃক্ষী যাবতীয় কার্যাবলী চালিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দাপটের সাথে, তখনও ইহুদীরা মুসলিম শাসকদের উদারতার সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্যের হত্যাকাণ্ডে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। ইহুদী জাতির অস্তিত্ব যখন হমকীর সম্মুখীন, খৃষ্টানদের হত্যাকাণ্ডের ফলে পৃথিবী থেকে ইহুদীদের নাম নিশানা মুছে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি যখন সম্পর্ক তখন একমাত্র যে মুসলিম জাতি তাদের আশ্রয় দিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায় অবৃত্তজ্ঞ ইহুদীরা সেই মুসলিম জাতিকেই ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে অপচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে।

বিশ্বের ইতিহাসে ইহুদী জাতি বিশ্বসংঘাতক ও সততা বিরোধী, সত্যকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত। হয়রত ইয়াকুব (আ:)- এর প্রথমা স্তুর গর্ভে দশজন এবং

বিতীয় স্তৰীয় গৰ্ভে দু'জন পুত্ৰ সন্তান জন্মগ্রহণ কৰেছিলো। প্ৰথমা স্তৰীয় গৰ্ভেৰ দশপুত্ৰ ঈৰ্যাপুৱায়ণ ও প্ৰতিহিংসাবশত সৎ ভাই ও পিতাৰ আদৱেৰ দুলাল ইউসুফ (আঃ)-কে চক্ৰান্ত কৰে মাৰাৰ জন্য কুপে নিক্ষেপ কৰেছিল। পৱে তাৰা তাৰ জামা কাপড় পশুৰ রক্তে রঞ্জিত কৰে পিতাৰ নিকট হাজিৰ কৰে বলেছিল যে, ইউসুফ (আঃ)কে বাষে খেয়েছে। আপন ভাইয়েৰ সাথে বড়বৰ্ষ ও চক্ৰান্তকাৰী ইয়াকুব (আঃ)-এৰ এই দশ পুত্ৰৰ পৱবতী বৎসুধৰাই ইতিহাসে 'ইসৱাইল' নামে পৱিচিত।

এই ইসৱাইলী ও পৱে ইহুদী নামে পৱিচিত সম্প্ৰদায় তাদেৱকে সত্ত্বেৰ পথে আহবান কৰাৰ জন্য যে কজন নবী তাদেৱ মধ্যে আগমন কৰেছিলেন তাদেৱ সকলেৰ নিৰ্দেশ লংঘন কৰে তাদেৱ সাথে গোড়াৰী, বেয়াদপী, মিথ্যা অপবাদ প্ৰদান কৰে এবং তাদেৱ নিকল্যুষ চৱিত্ৰে কালিমা সেপন কৰেছিল। ইতিহাসকে এৱাই কয়েক হাজিৰ নবীকে হত্যাৰ জন্য দায়ী। ইহুদীৱা ব্যক্তিবৰ্ধ সিদ্ধিৰ জন্য তাদেৱ আসমানী কিতাব তাওয়াতেৰ ইচ্ছেমত পৱিবৰ্তন ও বিকৃতি ঘটিয়ে স্বার্থ উদ্ধাৰ ও ধন সম্পদ অৰ্জনেৰ হাতিয়াৱে পৱিণত কৰে। রাসূল (সাঃ)-এৰ নবুয়াত সাতেৰ পৱ দৈনন্দিন এদেৱ শঠতা, ধূৰ্ততা ও মোনাফেকী চৱিত্ৰেৰ রূপ সম্পর্কে ওই নাজিল হতে থাকলে ইহুদীৱা তখন মুসলমানদেৱ কঠিন শক্রতে পৱিণত হয়। তাদেৱ ইসলামেৰ দাওয়াত জানালে তাৱা প্ৰতুৰে গোড়াৰী কৰে বলে, "এতো সেই জিবৱীল যে চিৱদিন আমাদেৱ বিৱৰণকে ওহী বহন কৰে এনেছে।" তাৱা ইসলাম গ্ৰহণ না কৰে বৱৰং ইসলামকে ধৰ্ম কৰাৰ চক্ৰান্তে লিঙ্গ হয়। ইসলামেৰ অভ্যুদায় থেকে ইহুদীদেৱ ইসলামেৰ সাথে সেই যে শক্রতাৰ সূচনা, মুসলমানদেৱ ধৰ্ম কৰাৰ চক্ৰান্তেৰ জাল বুনোন শুৰু তা আৱ কোন দিন থামেনি, বৱৰং যুগে যুগে

ইহুদী চক্ৰান্ত আৱও শানিত হয়েছে, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

তৃতীয় খলিফাৰ মৰ্মাণ্ডিক শাহাদাতেৱ ঘটনাৰ পৱ ইবনে সাবাৰ ইহুদী চক্ৰান্ত আংশিক সাফল্য লাভ কৰলেও ইবনে সাবা তাতে সন্তুষ্ট হতে পাৱেনি। ভয়কৰ জানেৱ অধিকাৰী এই পণ্ডিত ভাল কৰেই জানতো যে, তাৰ বড়বৰ্ষেৰ ফলে মুসলিম জাতিৰ যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে একদিন না একদিন তাৱা এৰ প্ৰতিশোধ নিবেই। তাৰ বড়বৰ্ষেৰ বৰূপ উৎঘাতিত হলে মুসলমানৱা সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে তখনই আবাৰ একীকৰণ হবে। সুতৰাং সে মুসলিম উশাহকে অনৈক্য, বিভাগি ও বিভেদেৰ মধ্যে নিমজ্জিত রাখাৰ জন্য এক দীৰ্ঘ মেয়াদী পৱিকল্পনা নেয়। একদল দক্ষ ও টেনিপ্রাণ্ট প্ৰচাৱক মুসলিম বিশ্বেৰ আনাচে কানাচে পাঠিয়ে দেয়। এসব প্ৰচাৱক দল কুৱাইন-হাদীসেৰ ভুল ব্যাখ্যা ও ইসলামেৰ মৌলিক বিশ্বাসকে বিকৃত কৰে নওমুসলিমদেৱ নিকট উপস্থাপন কৰতে থাকে। নও মুসলমানৱা প্ৰয়োজনীয় জানেৱ অভাৱে সহজেই এসব প্ৰতাৱকদেৱ প্ৰতাৱণাৰ শিকার হল। ফলে গোসব প্ৰচাৱক যে স্থানে ইসলামকে যেভাবে বিকৃত কৰে উপস্থাপন কৰেছে সেখানে সেই আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন সম্প্ৰদায়। এভাৱেই সৃষ্টি হয় শিয়া, খাৰেজী, ইসমাইলী, বাহাদু প্ৰভৃতি দল-উপদল-সম্প্ৰদায়েৱ। এদেৱ মন-মজ্জাম এমন উৎ চিষ্টা চেতনাৰ অনুপ্ৰবেশ ঘটনাৰ হল যে, এসব ভাস্তু বিশ্বাসেৰ লোকজন নিজেদেৱকে প্ৰকৃত মুসলমান মনে কৰতে লাগল এবং অন্যান্যদেৱ মোনাফেক, কাফেৱ এবং তাদেৱ ছল-চাতুৰী, চক্ৰান্ত বা যে প্ৰকাৱেই হোক হত্যা কৰা পূণ্যেৰ কাজ বলে মনে কৰতে লাগল।

এই ধ্যান-ধাৰণায় বিশ্বাসী ও সাবাপঁঠী হিসেবে পৱিচিতদেৱ হাতে ইসলামেৰ তৃতীয় ও চতুৰ্থ খলিফা শাহাদাত বৱণ কৰেছেন, কাৱিবালাৰ মৰ্মাণ্ডিক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া

যুগেৰ পৱ যুগ মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধ, ভাৰতীয়া লড়াই, শাসক উৎখাতে প্ৰসাদ বড়বৰ্ষ, বহিঃশক্তিৰ মুসলিম বিশ্বে হস্তক্ষেপেৰ পথ প্ৰশংস্ত কৰাৰ জন্য বিভীষণ তৈৱি এই সাবাপঁঠীৱাই সাধন কৰেছে।

১২৫৮ সালে মধ্য যুগেৰ ত্ৰাস বৰ্বৱ মোঙ্গলদেৱ হাতে মুসলমানদেৱ রাজনৈতিক ক্ষমতা খৰ্ব ও ৬০০ বছৱেৰ মুসলিম ঐতিহ্যেৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বাগদান সহ মুসলিম অধ্যুষিত প্ৰদেশ বিশ্বখ্যাত জান-বিজ্ঞানেৰ ক্ষেত্ৰভূমি সমৰকল, বুখাৰা, খোৱাসান, খাওয়াজিম, রঘু, আজারবাইজান, হামদান, দৱবল, শিৱওয়ান, কসবীন, তাবৰীজ, মৱাগান, মবাগ, আৱবল, তিবৰিজ, বসখ, নিশাপুৰ, হিৱাত, কুম, মঙ্গল প্ৰভৃতি ধৰ্মস্তুপে পৱিণত হওয়া ও লক্ষ লক্ষ নায়ী-পুৱৰ্ষ ও শিশু হত্যাৰ শিকার হওয়াৱ পেছনেও সক্ৰিয় ছিল সাবাপঁঠীদেৱ চক্ৰান্ত। খলিফা মুসতাসিম বিলাহ এৰ মন্ত্ৰী সাবাপঁঠী শিয়া ইবনুল আলকামীৱ বিশ্বাসঘাতকতাৰ কাৱণে কুখ্যাত হালাকু খান বাগদান আক্ৰমণ কৰে শহৱটিকে ধৰ্মস্তুপে পৱিণত কৰে। দুৰ্ধৰ্ষ চেইস খান বা হালাকু খান বৰ্বৱতা ও ধৰ্ম তাণুৰ চালিয়ে পুৱো এশিয়াকে বিধৰ্ষণ ও পদান্ত কৰলেও মুসলমানদেৱ বীৱত্তোৱ কথা শৱণ কৰে মুসলিম সম্বাজ্যে আক্ৰমণ পৱিচালনা থেকে বিৱত ছিলো। কিন্তু খলিফাৰ শিয়ামুল্লাহীৰ বিশ্বাসঘাতামূলক আমুদন ও সাহায্যেৰ প্ৰতিক্ৰিতি প্ৰদানেৰ পৱ হালাকু খান বাগদান আক্ৰমণ কৰে, মন্ত্ৰীৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফলে খলিফা নিৰ্মতাবে শাহাদাং বৱণ কৰেন। বাগদান নগৱীতে ৪০দিন পৰ্যন্ত চালানো হয় হত্যা, সুষ্ঠন ও ধৰ্ম তাণুৰ।

পাশ্চাত্যেৰ খৃষ্টীয়নদেৱ কৃত্তুক পৱিচা-লিত ক্ৰুসেড কালীন সময়ে ক্ৰুসেডাৰ বাহিনীকে প্যালেষ্টাইন প্ৰবেশ কৰাৰ পথ প্ৰদৰ্শক ছিলো প্যালেষ্টাইনী ইহুদীৱা। একই সময়ে মুসলিম বিশ্বেৰ অন্যতম শক্তিশালী

অঞ্চল মিশরে সাবাপছীদের চক্রান্তের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সুনী মুসলিম বিরোধী উগ্রপন্থী ফাতেমীয় শিয়াদের শাসন। কুসেডার বাহিনী যখন একেরপর এক মুসলিম শহর জয় করে ও শুরুন, ধ্বংস ও গণহত্যা চালিয়ে জেরুজালেমের উপকঠে হাজির হয় তখন তাদের প্রতিরোধে মুসলিম শক্তির প্রাগকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত মিশরের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু মুসলিম বিশেষ এই মহা দুর্বোগের সময় সাবাপছী শিয়াদের কারণে মিশরের কোন সহায়তা পাওয়া যায়নি। জেরুজালেমের পতনের দৃশ্য মিশরের শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত নিরক্ষতাপ চিন্তে উপভোগ করে।

এতাবে ইবনে সাবা মুসলিম উশাহর বুকে সূচ্ছভাবে যে ধ্বংস ও বিভেদের বীজ রোপন করেছিল তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে আজ প্রকাণ মাহিনহে পরিণত হয়েছে। এর পরও ইহুদী চক্রান্ত থেমে নেই। মুসলিম উশাহ যাতে কথোনো এই বিভেদ, হানাহানি থেকে ফুরসত না পায় সে জন্য নিত্য নতুন ইহুদী চক্রান্ত উত্তৃবিত হচ্ছে। মুসলিম উশাহ যাতে কথনে আর এক্যবন্ধ হতে না পারে সেজন্য গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠন ছি ম্যাসন, ওয়াত জিওনিষ্ট অর্গানাইজেশন। মুসলিম যুবশক্তিকে বিভাস করার জন্য মুসলিম দেশ সমূহে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সায়ন, সিও প্রভৃতি সেবার ছদ্মবেশধারী ইহুদী ক্লাব, এনজিও, ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী। মুসলিম যুব সমাজকে বিভাস করার জন্য প্রেস আর প্রচারণার হাতিয়ারকে ব্যবহার করছে অত্যন্ত সুকোশলে। কোন দেশে কোন লক্ষ্যে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বশর্ত হলো মানুষের মন্তিকে বিলুপ্ত ঘটানো। আর এই বিপ্লব ঘটানোর প্রধান হাতিয়ার হল সাহিত্য। এজন্য আধুনিক যুগে বিশ্ব মুসলমানদের বিভাস করার জন্য ইহুদী কবি, লেখকরা চরিত্র ধ্বংসকারী সাহিত্য রচনায় অধিক মনোযোগী হয়েছে। বিশেষ অত্যাধুনিক

ইলেকট্রনিক প্রচার মিডিয়া স্থাপন করে অনর্গল মুসলিম বিদ্যোৰী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী কর্তৃত ও প্রভৃতি স্থাপন করা ইহুদীদের মূল কথা। আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয় সাধনই ইহুদীদের মূল তৎপরতা। এজন্য ইউরোপে যখন পান্তি ও প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রভাবিত শাসন ও ধর্মের প্রভাবহীন শাসন ব্যবস্থা নিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক দল চলছিল তখন জেকব, হলিয়ক, ব্রেডলাক, সাউথওয়েল, থমাস প্রমুখ ইহুদী দাশনিকেরা নাস্তিক্যবাদী সেকুলারিজমের মতবাদ পেশ করেন। পান্তিদের শোষণে অতিষ্ঠ জনগণ এ মতবাদ মৃত্যুর মধ্যে লুক্ষে নেয়। পরবর্তীতে ইহুদী প্রচার মাধ্যমের প্রচারণার বাণিজ্যতে সেকুলারিজম, ভূখণ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র হয়ে দাঢ়ায় বিশেষ মহান (।) শাসন ব্যবস্থা। মুসলিম বিশেষ নেতৃত্বভাবে বিভাস মুসলমানদের নাকের ডগায় ইহুদীরা এই মহান শাসন ব্যবস্থার মূলো ঝুলিয়ে ধরে তাদের প্রশংস্ক করে। ইহুদী ও এই প্রশংস্ক মুসলমানদের প্রচার প্রোগাণ্ডার সংযোগে মুসলিম বিশেষ আজ সেকুলারিজম ও গণতন্ত্রের জয়বন্ধন হচ্ছে। এককালের মুসলিম বিশেষ প্রাগকেন্দ্র ভূমুক্ত থেকেই এই তথাকথিত নব-জাগরণের উদ্বোধন করা হয়।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রীসের খানার অধিবাসী শারতে শিবী নামক এক ইহুদী নিজেকে “মিসিহ মাউদ” নামী করলে বহু ইহুদী তার ভক্তে পরিণত হয়। এই প্রতারক সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদ্রবণ করে ইন্টার্বুল পৌছলে তুর্কী সুলতান মুহাম্মদ তাকে প্রেরণ করেন। পরে এই শিবী ভক্তদল সহ মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতকে ধ্বংস করার কুমতলবে মুসলমান বনে গিয়ে তুর্কী মুসলমানদের সাথে মিশে যায়। এই কুচকুরী মুসলমানদের আশ্রয়ে থেকে

খেলাফত ধ্বংস করার জন্য “ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা” নামে একটি সংগঠন কায়েম করে বহু তুর্কী যুবককে বিভাস করে। এদের তুর্কী সালতানাত উৎখাতের লক্ষ্যে প্ররোচিত করা হয়। ইতিহাসে এই কুচকুরী ‘দু’ন্মা’ মুসলমান হিসেবে পরিচিত। কালক্রমে এই সংগঠন জোরাদার হতে থাকে এবং ‘দু’ন্মা’ চক্রান্তকারীদের সংখ্যাও বাঢ়তে থাকে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরাজিত তুর্কী শক্তির যখন নিবু নিবু অবস্থা ঠিক তখনই এই ‘দু’ন্মা’দের পরিচালিত ‘ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা’ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সর্ব শক্তি নিয়ে হাজার বছরের ইসলামের ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতকে বিলুপ্ত করার জন্য বিশাঙ্ক ছোবল হানে। উল্লেখ্য তুর্কী খেলাফতকে ধ্বংস করার চক্রান্তে যারা প্রথম সারীতে ছিলো তাদের মধ্যে ডঃ নাজেম, ফওজী পাশা, তালাত পাশা, সগুম আকেন্দী, মাদহাত পাশা প্রমুখ সকলেই ছিল এই ‘দু’ন্মা’ সম্প্রদায়ের লোক। কামাল পাশাকে খেলাফত কাঠামো বাতিল করে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আমদানীতে এরাই ইন্দ্রন যুগিয়েছিল।

ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের শক্তি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিম বিশেষ সন্তানী হামলা চালিয়ে প্রতিভাবান ও ইসলাম দরদী মুসলিম নেতাদের হত্যা উদিয়ামান মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করা ও ইসলামী আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য এরা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে মধ্য প্রাচ্যে কায়েম করেছে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল ও এর গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি ও তা’ জিইয়ে রেখে আরব মুসলমানদের উথানকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে এই রাষ্ট্রটি চারবার আরবদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে বিস্তৃত আরব ভূমি দখল করেছে।

(২৩পৃঃ দেখুন)

চির মুসলিম দুশমন ইবনে সাবার উত্তরসূরী ইসমাইলীয়া আগাখানীদের প্রযোগ দুর্মাচন

মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

গত ৫ই মে ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের কথিত ইমাম প্রিস করীম আগাখান ৪ দিনের এক শুভেচ্ছা সফরে ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকা এসে পৌছলে সরকারীভাবে তাকে লাল গালিচা সহর্ধনা দেয়া হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কে এই আগাখান? কি তাঁর পরিচয়? মুসলমানদের সাথে আগাখানীদের সম্পর্ক কি? ইসমাইলীয়া সম্প্রদায় কি মুসলমান? বাংলাদেশ সরকার তাকে দাওয়াত করে এনে এত মর্যাদাই বা দিলেন কোন সূত্রে? এ প্রশ্ন গুলোর যথাযথ নিরপেক্ষ উত্তরদানের জন্যই বক্ষমান নিবন্ধের অবতারণা।

আমরা প্রথমেই আগাখান তথ্য তার অনুসারী ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং তাদের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করব। নবম শতাব্দীর শেষ দিকে দক্ষিণ পারস্যের (বর্তমান ইরান) আবদুল্লাহ বিন মায়মুন নামে জনৈক ব্যক্তি ইসমাইলীয়া মতবাদ উত্তোলন করেন। তিনি নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সা:)—কে সর্বশেষ নবী বলে সীকার করতেন না। তার মতে ইসমাইল ছিলেন সর্বশেষ নবী ও ইমাম। আবদুল্লাহ নিজেকে ইসমাইলের সহকারী মনে করতেন এবং এই মতবাদ প্রচারের জন্য শিয়াদের “তাকিয়া” অর্থাৎ কপট নীতির ন্যায় গুপ্ততার মীতিউত্তোলন করেন।

এই ইসমাইলীয়া সম্প্রদায় ইসনা আসারিয়া অর্থাৎ শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের স্থলে সাতজন ইমামে বিশ্বাসী। তারা মুসা-আল-কাজিমকে সগুম ইমাম বলে সীকার করে না। শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী জাফর-আস-সাদেক চারিত্রিক দোষের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে তার

উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেননি। উপরন্তু তার মৃত্যুর পূর্বেই ইসমাইলের মৃত্যু হওয়ায় দিতীয় পুত্র মুসা-আল-কাজিম সগুম ইমাম নিযুক্ত হয়। কিন্তু ইসমাইলী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, যেহেতু ইমাম মাছুম এবং সকল ডুল অস্তির উর্ধ্বে সেহেতু ইসমাইল মদ্যপায়ী হলেও তাকে দোষারোপ করা যায় না। এভাবে সগুম ইমামে বিশ্বাসীদের কর্তৃক ইসমাইল ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি পেলে এই সম্প্রদায়কে ইসমাইলীয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্প্রদায়ের নিকট সাত সংখ্যাটি খুবই পরিবিত্র। যেমন সাতজন ইমাম। তাদের বিশ্বাস মতে দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনে কেবল সাতজন নবী আগমন করেছেন। যথাঃ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), দ্বিসা (আঃ), মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসমাইল। তাদের অন্তবর্তীকালে সাতজন নীরব (গুপ্তভাবে) ধর্মীয় ইমাম ছিলেন। এদের মধ্যে ইসমাইল, আলী (রাঃ), আরন, পিটার অন্যতম। তাদের অন্যতম বিশ্বাস হল সগুম ইমাম ইসমাইল ‘ইমাম মাহদী’ রূপে ত্রাণ কর্তা হিসেবে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন।

এ মতবাদের উত্তোলক আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন শুরু থেকেই আবাসীয় খেলাফত খণ্ড এবং সুন্নী মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী গুপ্ত তৎপরতায় লিঙ্গ ছিলেন। তার মতবাদকে গোপনে প্রচার করার জন্য একদল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গুপ্ত প্রচারককে আবাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। বসরা এবং সালা-মিয়া ছিল তার মতবাদ প্রচারের অন্যতম ঘাটি। তার প্রচেষ্টায় কাঠার এবং কাতামা গোত্র এ মতবাদ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য ইয়ামানের সানার অধিবাসী

আবু আবদুল্লাহ আল-হসাইন এ মতবাদের প্রচারাগা আরও ব্যাপক জোরাদার করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেন। তারই প্রচেষ্টায় তিউনিশিয়ায় প্রথম ফাতেমী শিয়া খেলাফত স্থাপিত হয় (১০১৯ খঃ)। পরবর্তিতে এই ফাতেমীয় শিয়া বংশধর আল-মুই'জের সময় ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশরেও ফাতেমীয় শিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন কর্তৃক প্রচারিত ইসমাইলী মতবাদের অন্যতম অন্ধ ভক্ত পারস্যের আল-হাসান-আল সাবাহ কর্তৃক ১০১০ খঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম উপদল গুপ্তভাবক সম্প্রদায়। সেলজুক সুলতান মালিক শাহের সময় এই সম্প্রদায় গুপ্ত হত্যা, লুঠন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে ইসলামের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। গুপ্তভাবক দলের প্রতিষ্ঠাতা হাসান-আল সাবাহ ইরানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আলামূত পর্বত শিখের একটি সুরক্ষিত দূর্গ দখল করে শক্তি সংরক্ষণ করে এই তৎপরতা চালাত। পরবর্তিতে সাবাহ এই দূর্গকে কেন্দ্র করে আশে পাশে আরও বহু দূর্গ দখল করে নেয়। এই হাসান-আল-সাবাহ বিশ্বখ্যাত সেলজুক উজির নিজাম-উল-মুলকের সহায়ী ছিল। জান তাপস নিজাম-উল-মুলক ১০৬৫-৬৭ সালে বাগদাদে মিশরের ফাতেমীয়দের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-আজহারের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নিজামিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তবে যে উদ্দেশ্যে তারা আল-আজহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কায়িম করেছিলো সে উদ্দেশ্য ব্যার্থ হয়। কেননা পরবর্তীতে এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাতের আকীদায় বিশ্বাসীদের দখলে চলে যায়।) নিজাম নিজে ছিলেন সুন্নী মতবালী এবং তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিয়া মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হতো। ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে নিজামের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুন্নী প্রচারণায় ইর্দ্বার্বিত হয়ে উগ্রপন্থী আল-হাসান-সাব্বাহর নির্দেশে একজন ইসমাইলী গুপ্তাতক তাকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আতঙ্ক ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রিয় উজীর এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে সুলতান মালিক শাহও সে বছরই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। এ ঘটনা সেলজুক বংশের স্থায়িত্বে 'মারাত্মক আঘাত হানে। মালিক শাহ মৃত্যুর পূর্বে গুপ্তাতকদের আড়ান্তুল আলমূত দুর্গ দখলের জন্য অভিযান প্রেরণ করলেও তা' সফল হয়নি। কিন্তু ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খান এই দুর্গসহ গুপ্তাতকদের সকল দুর্গ ধ্বংস করে দিলে গুপ্তাতকদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় হত্তিয়ে পরে। গুপ্তাতকদের নেতৃত্বে হাসান-আল-সাব্বাহ এর পরবর্তি বংশধরেরা প্রচার করতে থাকে যে, "আল্লাহ সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না, সুতরাং বিশেষ কোন ধর্মে (ইসলামে) বিশ্বাস করা উচিত নয়।" (নাউয়ুবিয়াহ) এজন্য সুন্নী মুসলিম জগতে এরা 'মোলহিদ' বা অপচৃত বিধৰ্মী হিসেবে পরিচিত।

মোঙ্গলদের কর্তৃত ভাগ্য বিপর্যয়ের পর এ সম্প্রদায় দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশে ছুরচাড়া জীবন যাপন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এরা ইংরেজদের গোয়েন্দা পুলিশের এজেন্ট রূপে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর জন্য ইরানে প্রবেশ করে। কিছু দিন পর সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এরা ইরান থেকে বহিস্থূত হয় এবং আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়। আফগানিস্তানেও এরা ইংরেজদের সহযোগিতায় একটি ইসমাইলী রাষ্ট্র কায়েমের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। এই গুপ্তাতক ইসমাইলীদের

চতুর্ভুক্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ভারত বর্ষের আজাদীর অন্যতম সিপাহসালার মাওঃ ওবায়দুল্লাহ সিঙ্গি (রঃ) শহীদ হন। ইংরেজদের একনিষ্ঠ দালালীর পুরক্ষার স্বরূপ এই সম্প্রদায় ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তান থেকে উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং করাচী, বোংবাই প্রভৃতি বাণিজ্যিক শহর গুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। পরবর্তিতে এরা একটা ধনকুবের সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সেই গুপ্তাতক ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী হলেন আজকের আলোচ্য ধনকুবের 'প্রিস করীম আগাখান'।

এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তির শুরু থেকে সুন্নী মুসলমান এবং তাদের মতবাদের বিরোধীতাকারী সকল সম্প্রদায়কে গুপ্তাত্যার মাধ্যমে দমন করার নীতি গ্রহণ এবং 'তা' বৈধ ও ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে। এ জন্য এরা সর্বদা মুসল-মানদের স্বার্থের বিরোধী এবং তাদের ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। আজো পাকিস্তানে বসবাসরত এই ইসমাইলীয়া শিয়ারা তাদের গুপ্ত ঘাতক চরিত্র কড়ে ধরে আছে। বাংলাদেশেও এদের পদচারণা সবর হয়ে উঠে পাকিস্তানে অহরহ সংঘটিত শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার হোতা এই সম্প্রদায়। এরা প্রথ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বদের হত্যা থেকে শুরু করে মসজিদে বোমা নিষ্কেপ করে মুসল্লীদের হত্যা, বাসে, টেনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাত্রীদের নির্বিচারে হত্যা করে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। পাকিস্তানের অন্যতম ধর্মীয় সংগঠন "সিপাহি সাহাবাৰ" সভাপতি প্রথ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ হক নেওয়াজ জঙ্গী রহঃ তাদের এই গঠিত তৎপরতার সমালোচনা করতেন বলে ইসমাইলী গুপ্তাতকেরা এক সন্তুষ্মী হামলা চালিয়ে তাকে শহীদ করে দেয়। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করলে আগাখানের অনুসারী

ইসমাইলী শিয়ারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এবং আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভূমিকা নেয়। আফগানিস্তানের দাখান অঞ্চলে এই ইসমাইলীয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা সোভিয়েত বাহিনীকে এ এলাকায় প্রবেশ এবং ঘাটি স্থাপন করার সুযোগ করে দেয়। এই দাখান অঞ্চল আফগানিস্তানের একমাত্র এলাকা যা রূপ বাহিনী বিনা বাধায় দখল করে নেয় এবং স্থানীয়দের সাহায্য লাভ করে। ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির সদস্যরা অবোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ তেজে ফেললে এই ইসমাইলী সম্প্রদায় হিন্দুদের সমর্থন করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে বিহোদ্ধগ্রাণ করতে থাকে। ১৯৮৭ সালে মুসলিম জাতিসভা রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে আগাখান হিন্দুদের কঠে কঠ মিলিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি ও জিয়াহর দাবীর বিরোধিতা করে। মোটকথা এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি এবং ক্ষতি সাধন করেই আসছে।

এবারে আমরা ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের যুগ ইয়াম বলে কথিত প্রিস করিম আগা খানের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করব। পাকিস্তানের করাচী থেকে ইস্মাইলীয়া এসেসিয়েশন থেকে প্রকাশিত এয়ার ল্যাঙ্গ গাইডে আগা খান মন্তব্য করেছেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশের সাথে আমার সম্পর্ক। দু'কোটিরও বেশী মুসলমান আমার অনুসারী। তারা আমাকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে বলে বিশ্বাস করে, আমাকে খাজনা দেয় ও আমার ইবাদত করে। একারণে যে, আমার ধর্মনীতে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রক্ত প্রবাহমান।"

অর্থাৎ তিনি মনে করেন ধর্ম একটা জমিদারী তালুক। তার কাছে ধর্ম আমাদের দেশের ভও পীরদের ন্যায় একটা ব্যবসা

মুলধন বিশেষ। কিছু লোকের মনে নিজেকে ধর্মের মহান পুরুষ এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের পায়ের ওপর হরমুর করে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর বিনিময়ে ট্যাঙ্ক আদায় করতে হবে। ব্যাস, তাহলেই আর কোন সম্পর্কের প্রয়োজন নেই মুহাম্মদ (সা):—এর সত্যিকার বংশধর বনে যাওয়া যাবে।

এই গাইডের অন্য এক স্থানে আগাখান অন্যান্য মতাবলীদের কটাচ করে বলেছেন, “হিন্দু মুসলমান সকলেই ক্রমন করবে। ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষী, পুরান পাঠ করলেও ক্রমন করবে, মোঘলা-কাজী কুরআন পড়েও ক্রমন করবে। কারণ, এরা সত্য বাদশাহ তথা ইমামের হেফাজত লাভ করতে পারেন। এসব পথগুলি লোক পীর তথা ইমামের পরিচয় না পাওয়ার কারণে ক্রমন করবে। শুধু সেই ব্যক্তি যে ইমাম ও আলীর সঙ্গান পেয়েছে সে ক্রমন করবে না।” তারতের বোঝাই থেকে প্রকাশিত ইসমাইলীয়া এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসমাইলীয়া কিতাব ‘ফালামে ইমামে মুবিনে’ আগা খানের অনুসারীদের ধর্মত সম্পর্কে বলা হয়েছে, “হযরত মাওলা মুরতজা আলীর মধ্যে আল্লাহর নূর থাকার কারণে এবং হযরত আলীর মোবারক নাম উচ্চারণ করলে আল্লাহর নূর অনুভূত হওয়ার কারণে আমরা কালেমার মধ্যে হযরত আলীর নাম ব্যবহার করি। আলী আল্লাহ। তথা আল্লাহর মধ্যে আলী আছেন বা আলীর মধ্যে আল্লাহর নূর বিদ্যমান।”

“মুরশিদ তথা যুগ ইমাম সব কিছুই জানেন। তিনি যদি ইমামের মৃত্যির পরিবর্তে মদকে সেজদা করতে বলেন, তাহলে তাই করতে হবে। কারণ মুরশিদের আদেশ অলংঘনীয়।”

“মুরতজা আলী মহান ব্যক্তি। তার নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। তিনি সীম শক্তি বলে পাপ মোচন করিয়ে মানুষকে জারাতে নিয়ে যেতে পারেন।”

“খীফা ওসমান (রাঃ):—এর শাসনামলে কুরআনের কিছু অংশ রেখে বাকী অংশ

বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল।”

“যুগ ইমামের নিকট সব সময়ই একটি নতুন জিনিস থাকে যা তৎক্ষণাত্মে বলা যায় না। তিনি পরে তা আমাদের বলে দেবেন।”

“মহিলাদের জন্য বোরকা পরিধান করা মোটেই ভালো নয়। অন্তরের চোখে লজ্জার পর্দা থাকাই যথেষ্ট। এতে তোমাদের অন্তরে কথনো কুচিষ্ঠা আসবে না।”

“মানুষ কারবালায় গিয়ে কেন অনর্থক সময় নষ্ট করে? ইমাম হোসাইন তো এখন জামাত খানায়—ই থাকেন। কাজেই তোমরা এখানেই (জামাত খানায়) এসো।”

“তোমরা এ যাবত যত শুনাই করেছো আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে আর শুনাই করবে না।”

আমাদের আধ্যাত্মিক সম্মানদের সর্ব প্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব হলো পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করা। বৃটিশ সরকার আপনার ধর্ম ও স্বাধীনতা সব কিছুই রক্ষা করবেন। তাই পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সর্বশক্তি ব্যব করে তাদের সেবা করে যাওয়া উচিত।

বোঝাই থেকে প্রকাশিত অন্য আর এক কিতাব ‘কালামে এলাহী’ তথা ফারাসীনে ইমামে মুবেনে বলা হয়েছে “যদি রাখতে হবে যে, যুগ ইমামের আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহর আনুগত্য। ইমামের নির্দেশ মান্য করা আল্লাহকে মান্য করার—ই নামান্তর।”

আমরা ইমামী ইসমাইলী সম্প্রদায়। যুগ ইমামের মুরীদ। আল্লাহর নূর যা যুগ ইমামের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা তাকে সেজদা করি।

“ইয়া আলী মদদ” আমাদের সালাম। “মাওলা আলী মদদ” আমাদের সালামের জবাব। উঠতে বসতে “ইয়া আলী মদদ” বলে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ইয়া আলী মদদ বল। ধর্মীয় শিক্ষাক্ষণে যাওয়ার সময় “ইয়া আলী মদদ” বল। ঘরে প্রবেশ করার সময় “ইয়া আলী মদদ” বল। মা-বাপকে

“ইয়া আলী মদদ” বলে সালাম কর। তাই বোনকে “ইয়া আলী মদদ” বলে সালাম কর।”

কুরআনের সঠিক জ্ঞান এবং এর লুকায়িত রহস্যবলীর প্রকৃত অর্থ যুগ ইমামের—ই—জানা আছে। যুগ ইমাম হলেন জীবন্ত কুরআন। তার নির্দেশবলী মেনে চলা উচিত। এতে দুনিয়ার আলো নিহিত।

“ইয়ামের হাত খোদার হাতের সমান, ইমামের চেহারা খোদার চেহারার সমান। পূর্ণ আস্থার সাথে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করা ব্যবহার খোদার সাথে সাক্ষাতের নামান্তর।”

“কুরআন সর্বমোট চল্লিশ পারা। তার মধ্যে ত্রিশ পারা দুনিয়ার মানুষের নিকট আর অবশিষ্ট্য দশ পারা আছে ইমামের ঘরে। এই দশ পারাকে ‘ফতহারদী’ বলা হয়। এই দশপারা কুরআনই ইমামের ভাষা।”

যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে আলীর অনুসরণ করবে; তার সম্মান সন্তুতি বৃদ্ধি পাবে এবং সে সফলতা অর্জণ করতে পারবে। তাই তোমরা আলীর আনুগত্য ও ইবাদত করতে থাক। বস্তুত আমাদের এই আলী—ই হলেন প্রকৃত মুষ্টি।” নাউয়ুবিল্লাহ

এছাড়া এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, অজু করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের অন্তর সর্বদাই অজুময় থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের পরিবর্তে জামাত খানায় (মসজিদের পরিবর্তে ব্যবহারিত) গিয়ে তিনি সময় দেয়া করা প্রতিটি আগা খানীর উপর ফরজ। রোখা ফরজ নয়। খানা পিনা বক্স করলেই রোখা হয় না। রোখার সম্পর্ক চোখ কান ও যবানের সাথে। যাকাতের পরিবর্তে তারা টাকা প্রতি দু’আনা জামাত খানায় দেয়া ফরজ মনে করে। ইত্যাদি।

আগা খানীরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের মতাদর্শ থেকে স্পষ্টতই প্রত্যয়মান হয় যে, তারা ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা, যাকাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোখা, অজুকে স্বীকার করে না অর্থাৎ তারা ইসলামের এই প্রেষ্ঠ রঞ্জন সমূহের অধীকারকরী। ইসলামী বিধান

অনুযায়ী ফরজ অবীকারকারী কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায় তাদের যুগ ইমামকে (বর্তমান করীয় আগা খান) সিজদা করাকে অবৈধ বলে মনে করে না। অথচ ইসলাম একে শিরক এবং মহা পাপের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। আলী (রাঃ) ইসলামের চতুর্থ খলিফা এবং রাসূল (সা:)—এর একজন সম্মানিত সাহারী মাত্র। কিন্তু এই সম্প্রদায় তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে তুলনা করেছে। এদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি মানুষের পাপ মোচন করে দিতে পারেন, সন্তান ও ধন—সম্পদ দিতে পারেন। অথচ এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহই বলে ব্যং আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন। এরা কুরআন শরীফের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকে অথচ কুরআনের বিশুদ্ধতা সর্বজনবীকৃত এবং প্রমাণিত। যুগ ইমামকেও আল্লাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে আচর্যজনক ব্যাপার হল এটি পৃথিবীর এমন একটি ধর্মত যার

রক্ষক হিসেবে অন্য ধর্মাবলী খৃষ্টান ভূমি ইংল্যাণ্ডকে মনোনীত করা হয়েছে এবং এর বিনিয়য়ে প্রতিটি ইসমাইলীয়াকে বৃত্তিশ সরকারের সহযোগিতার নামে গোলামী করাকে ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে।

আগা খানীদের এমন উন্নত, ইসলাম বিরোধী এবং বিভাস্তিক মতাদর্শের কারণে বিশ্বের সকল বরেণ্য আলিম এদের অমুসলিম কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, এদেশের কোটি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার সম্পত্তি এই অমুসলিম সম্প্রদায়ের কথিত ইমাম আগা খানকে বিপুল সহর্ঘনা ও সম্মান জানিয়ে তাঁকে একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমাম বলে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। আমরা জানি না সরকার কোনু দলিল সূত্রে সারা বিশ্বে অমুসলিম হিসেবে ঘোষিত এই সম্প্রদায়ের নেতাকে মুসলমান বলে ফতোয়া দিলেন। তবে যতদূর সত্ত্ব আমরা জানি সরকার এই ধনকুবেরকে

এদেশে অর্থ বিনিয়োগে প্রশংস্ক করার জন্য এত বিপুল সম্মান দেখিয়েছেন, মুসলমান বলে আমাদের কাছে পরিচিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রশংসন জাগে, আমরা কি এত কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি যে বেঁচে থাকার জন্য আজীবন ইসলামের দুশ্মনদের অর্থ সাহায্যের জন্য ইসলামকে অপব্যবহার করতে হবে? ধর্মের চেয়ে ইমানের চেয়ে টাকার মর্যাদা কি বেশী? সাপের মাথায় মনি আছে বলে তা প্রাণিগত জন্য কি সাপের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো বুদ্ধিমানের কাজ? আগা খানকে এবারই প্রথম নয়, এর পূর্বেই চারবার এদেশ সফরের সময় তাকে মুসলমান বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, ভবিষ্যতে বৈষয়িক প্রাণিগত বিনিয়য়ে কেউ যদি একটা গাধাকেও স্কট-টাই পরিয়ে, মুসলমানের রং লাগিয়ে তাকে ধর্মীয় ইমাম বলে চালিয়ে দেয় তাহলে এদেশ থেকে মুসলিম বলে সার্টিফিকেট পেতে সেটির কোন বেগ পেতে হবে না।

ইাপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- ⊕ গ্যাষ্টিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- ⊕ প্রস্তাবে শ্বয়, ঘনঘন প্রস্তাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্তাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- ⊕ ব্র্যাপ দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- ⊕ সিফিলিস, গনেরিয়া, প্রস্তাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পূজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রী ব্যাধি

- ⊕ শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- ⊕ অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্রেতী, সুলী, ব্রন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মণ্ডিকের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চূল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিষ্যতা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রম্য তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ

হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাএকি সংলগ্ন)

মিরপুর, ঢাকা-১২১২২

মধ্য প্রাচ্য সমস্যার মুসলিম কোথায়?

ইবনে বতুতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের সাথে বিজড়িত এক ভূখণ্ডের নাম ফিলিস্তিন। বহু নবী (আঃ) এর পূর্ণ শৃঙ্খলায় বিজড়িত এই ফিলিস্তিন। এই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছেন ইসাঃ (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ সহ সহস্রাধিক সম্মানীয় নবী। এই ভূখণ্ডে ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ)-এর তাওহিদের বাণী প্রচার ক্ষেত্র। মুসলমানদের প্রথম কেবলা, অন্যতম পবিত্র শৃঙ্খলায় আল-আকসা মসজিদ এই ভূ-খণ্ডেই অবস্থিত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শৃঙ্খলায় উমর মসজিদও এই ভূ-খণ্ডে দাঢ়িয়ে আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ বর্ষে আবু ওবায়দা (রাঃ) ও খালেদ বিন উয়ালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুক প্রান্তে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করলে ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে আসে। সেই থেকে কয়েক বছর ব্যতিত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরী একই সাথে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ভূমি হওয়ায় এই নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ ফিলিস্তিনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক প্রলয়কারী ধর্মসের তাওহ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আক্রমণে এ ভূখণ্ডে বারংবার রক্ত রঞ্জিত হয়েছে, অশাস্তির চেতু বয়ে গেছে তার উপর থেকে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, মক্কা-মদিনার পর

মুসলমানদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং ঐতিহাসিক ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিন আজ আর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আল-আকসা মসজিদ আজ বেদখল, ফিলিস্তিন নামক ভূ-খণ্ডটির নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই ভূ-খণ্ডটি জবর দখল করে পাঞ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম বিশ্বের এক অগুর্ত মুহূর্তে এর বুকের উপর চাপিয়ে দেয় এক জগন্মল পাথর অবৈধ রাষ্ট্র “ইসরাইল”। সাম্রাজ্যবাদী ও জায়ানবাদীদের আগ্রাসন ফিলিস্তিনকে গ্রাস করেই থেমে থাকেনি, তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে আরও বিস্তৃত আরব ভূ-খণ্ড, পবিত্র নগরী জেরুজালেম এবং আল-আকসা মসজিদ।

পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র এই ইসরাইল। মুসা (আঃ)-এর প্রচারিত তাওহীদ ও আসমানী কিতাব তাওহাতকে বিকৃতিকারী এবং অভিশঙ্গ ইহুদীরা এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস, সকল প্রকার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করে পেশী শক্তির বলে এবং সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এই রাষ্ট্রটির বুনিয়াদ গড়ে তোপা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সকল ঐতিহাসিকগণের মতে, খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহুদী উপজাতিগুলি ভাগ্য উন্নয়নের আশায় আরব উপনিব থেকে কেনানের পার্বত্য এলাকায় (বর্তমান সিনাই উপত্যকা) বসবাস করতে শুরু করে এবং কালক্রমে তাদের বৎশধরেরা ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াকুব (আঃ)-কে আধুনিক ইহুদী নামে পরিচিত ইসরাইল জাতির জনক বলা হয়। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই অনুর্বর ও পার্বত্য ফিলিস্তিন ত্যাগ করে ৫০ লক্ষের মধ্যে ৪৩ লক্ষ ইহুদী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চলে যায়। একই

সময়ে রোমানরা ফিলিস্তিন দখল করে ইহুদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ফলে ফিলিস্তিনের বাকী ইহুদীরা দেশ ত্যাগ করে অন্তর চলে যায়। ঘোল শতকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা দাঢ়ায় মাত্র পাঁচ হাজারে। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীরা পাঞ্চাত্যের ঘারে পা রেখে ডাঢ়াটিয়া হিসেবে জড়ো হয়ে যে ইসরাইল রাষ্ট্রটি কায়েম করে ফিলিস্তিনের ওপর নিজেদের অধিকার দাবী করেছে তা’ ঐতিহাসিকভাবেই অযৌক্তিক। এসব ইহুদীরা এবং তাদের পূর্বপুরুরাও সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা নয়। দূরদেশের বাসিন্দা এসব ইহুদীরা তাদের দাবীকে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যুক্তিসংগত প্রমাণের উদ্দেশ্যে যে ধর্মীয় কর্মকাহিনী প্রচার করে থাকে তা কোন ভাবেই ধোপে টেকাতে পারছে না।

ইহুদীরা জুড়াইক কর্মকাহিনী, জেরুজালেমের ঐতিহাসিক শৃঙ্খল জিওনের পবিত্র পাহাড়, বহু নবী (আঃ) এর শৃঙ্খলায় বিজড়িত আল-আকসা মসজিদ জেরুজালেমে অবস্থিত বলে ইহুদীরা জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দাবী করলে দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনের বাসিন্দা আরব মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র শৃঙ্খলায় মসজিদ যে ভূ-খণ্ডে অবস্থিত সেখানে রাষ্ট্র গঠন দূরে থাক বসবাসেরও অধিকার পাবে না কেন?

ধর্মীয় রূপকথাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী স্থীকার করে নিলে দুনিয়ার সকল মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে আরব নাগরিকদের বিহুকার করে মক্কা মদিনাকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম

করে তবে তাদের সে দাবী কি যৌক্তিক হবে? বিশ্বের ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ভ্যাটিক্যানকে কেন্দ্র করে ইটালিয়ানদের তাড়িয়ে যদি একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তবে ইটালীর নাগরিকেরা কি সে দাবী মেনে নিবে?

অর্থ আধুনিক সভ্যতার নির্মাণে দাবীদার কামার কুমারেরা এই সভ্য যুগেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই যুক্তিহীনতা এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্কারী বর্বরদের প্রশ্রয় ও শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীদের তাদের অপরাধ চালিয়ে যেতে ইঙ্গন যোগাচ্ছে। ইটালিয়ানদের দেশছাড়া করে যদি ভ্যাটিকান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের খৃষ্টান রাষ্ট্র কায়েম করার সুযোগ করে দেয় তবে ইটালিয়ানদের ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বাধা প্রধান করার অধিকার ন্যায় সঙ্গত এবং সভ্যতাগতী বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃতও। অর্থ এই সভ্য যুগের আইন কানুনই ফিলিস্তিনীদের বেলায় প্রয়োগ হচ্ছে বিপরীত ভাবে। ফিলিস্তিনী আরবরা দেশটির শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও এবং জায়ানবাদীদের আগ্রাসনকে প্রতিহত করার অধিকার ন্যায় সঙ্গত হলেও তা' সাদা দুনিয়ার সভ্য মানুষেরা মানতে চান না। তাদের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনীরা সন্ত্বাসবাদী, তারা মানবতার ঘৃণিত শত্রু।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহুদীদের কখনও কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আল্লাহর অভিশপ্ত এ জাতি ছিল সর্বত্র সাধনা ও ঘৃণার শিকার। চক্রাত, খৃত্যী এবং গঙ্গোপ সৃষ্টি করে স্বার্থ উদ্ধার ইহুদীদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিণত হওয়ায় ইউরোপের প্রতিটি দেশে এরা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এছাড়া যিশু খ্রিস্টের [ইসা (আঃ)] এর হত্যা প্রচেষ্টার সাথে ইহুদীরা জড়িত ছিল বলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষকাল পর্যন্ত পাচাত্তের ইহুদীরা খৃষ্টানদের কর্তৃক পথেঘাটে হত্যার শিকার হত। এ সময় পর্যন্ত ইহুদীরা ছিল খৃষ্ট

জগতের অন্যতম শত্রু। এই সময়ে খৃষ্টান জগত মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বারংবার ক্রসেড চালিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করতে না পেরে ঝুঁত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুক্তে পাচাত্তের খৃষ্টান মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্রসেড পরাজয়ের ঘোল আনা প্রতিশোধ নিতে উদ্বোগী হয়। তারা মুসলিম শক্তিকে চিরদিন দমন করে রাখার উদ্দেশ্যে কাটা দিয়ে কাটা কোলার কুমতল আটে। এই যুক্তে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে তুকী উসমানীয়দের কর্তৃক ৪০০ বছর যাবৎ শাসিত ইরাক, সিরিয়া দখল করে। ফিলিস্তিন ও সেবানন তখন সিরিয়া প্রদেশের অংশ ছিল। ভাগাজিগির স্বার্থে ফ্রান্স ও বৃটেন ফিলিস্তিনকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বৃটেনের দখলে চলে যায়। যুদ্ধ চলাকালে ইহুদী ডাক্তার উইজ্যান বৃটেনকে উড়োজাহাজ তৈরির সূত্র দিয়ে সাহায্য করার বিনিময়ে ইহুদীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের গোপন প্রতিশ্রুতি আদায় করে। জার্মানীর হিটলার বিশ্বাস্যাতক ইহুদীদের পাইকারী হত্যার নির্দেশ দিলে পলাতক ইহুদীরা মিত্র পক্ষের ছত্রায় নিজস্ব ইউনিট গঠন করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এসব ইহুদী ইউনিট তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সাথেও যুক্তে অংশ নিয়েছিল। এ ছাড়া ধনী ইহুদী ব্যাক্সার গোষ্ঠী যুক্তের সময় মিত্র পক্ষকে দেয়া বিপুল পরিমাণ ঋণের বোৰা মণ্ডকুফের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের শর্ত আরোপ করলে পাচাত্তের তাদের এককালের শক্তদের মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর বসিয়ে ছড়ি যোরানোর জন্য ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা নেয়। এভাবেই ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে এক অন্তর্বৰ্তী আতাতের ফলে সৃষ্টি হয় জারাজ রাষ্ট্র ইসরাইল। ১৯২২ সালে বৃটেন সাম্রাজ্যবাদের ধর্মাধারী তৎকালীন জাতিসংঘ (লিগ অব ন্যাশনস)কে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনে ম্যানডেটরী শাসন কায়েম করে। এই সময়ে

ফিলিস্তিনে আরব মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, অন্যদিকে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ হাজার। লিগ অব ন্যাশনসের ম্যাণডেটরী শাসনের হকুমনামার অপ্রয়বহার করে বৃটেন ক্রমাগত ইহুদীদের আমদানী করে ফিলিস্তিনে জয়া করতে থাকে এবং ১৯৪৭ সাল নাগাদ ইহুদীদের সংখ্যা দাঢ়ায় ১০ লক্ষ। ইহুদী ধনকুবের থচাইও হার্ষ ও অন্যান্যদের অর্থ ব্যবহার করে ইহুদীরা এ সময় অত্যাধুনিক অন্ত-শক্ত ক্রয় ও নিজস্ব সন্ত্বাসবাদী দল গঠন করে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর ব্যাপক জুনুম-নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও খেদাও অভিযান চালিয়ে ভূমি দখল করতে থাকে। ১৯৪৭-৪৯ খৃষ্টানদের মধ্যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী নিহত হয়। অবশেষে লিগ অব নেশনস ঘোষিত বৃটেনের ম্যাণডেটরী শাসনের অবসান ঘটলে বৃটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইহুদীরা ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

জন্মগ্রহ থেকেই ইসরাইল রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি মালা সংযুক্ত, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শণ ও অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর সন্ত্বাসী হামলা চালানো রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রতিবেশী আরবদের ওপর চাপিয়ে দেয় বেশ কয়েকটি রাজক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রতিবারই পরাশক্তি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র অন্ত, সৈন্য ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে ইসরাইলকে আরবদের রোষানল থেকে রক্ষা করে। ১৯৬৭ সালের যুক্তে রাশিয়া, মিশরের সাথে বেঙ্গলী করে এবং আমেরিকার বিপুল পরিমাণ সৈন্য ইহুদীদের পক্ষে লড়াই করায় পর্যবেক্ষণ ইহুদীরা কোন মতে রক্ষা পায়। সেবারই তারা আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়, মসজিদ অবমাননা করে এবং আরবদের ৬৭ হাজার বর্গ মাইল এলাকা দখল করে নেয়।

ইসরাইল-ইহুদী আগ্রাসন এখনও অব্যাহত আছে। ইসরাইলকে টিকে থাকার জন্য মদদ যোগাচ্ছে বৃটেন, ফ্রান্স এবং

বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র। পাঞ্চাত্য তাদের এককালের শক্তিদের ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের সূতিকাগার মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাগরণ ঠেকাতে চাষ্টে। তাদের প্রধান শক্তি মুসলমানদের দমন করাচ্ছে। আরব বিশ্বের হাজারো সমস্যার পেছনে রয়েছে ইসরাইল। বলা যায় এই ইসরাইলই হল মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমস্যা। পাঞ্চাত্য তেলের সরবরাহ নিরাপদ রাখা এবং মুসলমানদের দমন করার জন্য একদিকে ইসরাইলের সমরাক্ষ ভাগারের কলেবর বৃক্ষিতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে আরবদের শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিচ্ছে। ইসরাইলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যে কোন মুসলিম দেশের সামরিক শক্তি যাতে বৃক্ষ না পায় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা তৎপর। এইতে সেদিন ইরাকের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়া হল, অতীতে মিশরকেও বেশ কয়েকবার হেস্ত নেষ্ট করা হয়েছে একমাত্র এই কারণে। এছাড়া আরবরা কখনো ঐক্যবন্ধ না হতে পারে সেজন্য আরব উপদ্বিপক্ষে টুকরো টুকরো করে কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং ভূ-সীমানা ও জাতীয়তা প্রভৃতি কৃতিম সমস্যার সৃষ্টি করে একটি দেশকে অন্য দেশের শক্তিতে পরিণত করে রাখা হয়েছে। ইরাক-কুয়েত, ইরাক-ইরান, কুদ্দী, ইয়ামেন-সৌদী আরব, ইরান-আরব অধিবাসী, সুদান-মিশর প্রভৃতি দেশের মধ্যে যে ভূ-খণ্ডগত বিরোধ ও যুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে ব্র্টেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কালো হাত। প্রথম বিশ্বযুক্তের পর এই সব শক্তি দীর্ঘ ৪০০ বছর ধীরে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন বিভিন্ন এলাকার আরবদের জাতীয়তাবাদ, সেকুলারিজম, কম্যুনিজম, গণতন্ত্রের বুলি শিথিয়ে বিভাস্ত করে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ফ্রান্সের সরকার কামে হওয়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা

রাজনৈতিক ঠাণ্ডা সড়াই চলতে থাকে। ইরাক-সিরিয়া, ইরাক-মিশর, গিবিয়া-সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের পারম্পরিক বৈরিতা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ইসলামের পক্ষে বা ইসরাইলের বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ নিলে তাকে গুণ্ঠ হত্যার শিকার হতে হয়েছে অথবা ক্ষমতালোভী সামরিক অফিসারদেরকে গেলিয়ে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। অতএব একবাক্যে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী চক্র মধ্য প্রাচ্যের তেল লুঠন করে নেয়া এবং ইসলামের পূর্ণাগরণ ঠেকানোর জন্য ইসরাইলের অংকুরিত হওয়া থেকে তার গোড়ায় পানি ঢেলে একটা প্রকাণ মাহিমহে পরিণত করেছে। ইসরাইলের চৌকিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত কৃতিম সমস্যা সৃষ্টি করে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে।

অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রভু মুসলমানদের এসব জাতীয় স্বার্থের শক্তিদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মধ্য প্রাচ্যের সমস্যাকে আরো জটিলতা করে তুলেছে। এই আরবের বুকেই বিশ্ব কৃত্যাত বিশ্বাস্থাতক শরীর ইসলাইমের জন্য এবং তাদের সামনে তার বিশ্বাস্থাতকতার মর্মাণ্ডিক পরিণতির জৃপ্ত ইতিহাস থাকতেও তারা সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। এরা ইহুদী এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত শক্তিগুলোর নির্বজ্জ দালালী করে মুসলিম স্বার্থের বুকে অহরহ ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এসব গদিবদী রাষ্ট্রপ্রভুরাও একটা মন্তব্য অন্তরায়।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে ফিলিস্তিন উদ্ধারের জন্য আরবরা বিভিন্ন প্রকারের সশস্ত্র সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছে। কিছু পরাশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, অস্তর্জন্তিক অবৈধ চাপের নিকট নতি

স্বীকার এবং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ফিলিস্তিন আজও আরবদের নাগালের বাহিরে। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনী আরব মুসলমানদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংগ্রামের নেতৃত্বান্বকারী প্রধান সংগঠনটি পরাশক্তির কর্মণা লাভের আশায় ইসলামের আদর্শের চেয়ে সেকুলারিজম ও কম্যুনিজমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে এটি পাঞ্চাত্যের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত ভূ-খণ্ডের ওপর জেকে বসা ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে কুন্দ গাজা ভূ-খণ্ডের স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে ইহুদীদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে প্যারিস, রোম, নিউ ইয়র্ক, ওয়াসিংটন ছুটছে।

মধ্য প্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে হলে আরবদের চিষ্টা-চেতনায়ও ব্যাপক পরিবর্তন অপরিহার্য। দীর্ঘ দিনের পাঞ্চাত্যের ইসরাইল সম্পর্কিত ভূমিকা থেকে স্পষ্টতাই প্রতিয়মান হয় যে, পাঞ্চাত্য ইসরাইলের স্বার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটুক বা তার অস্তিত্ব হৃষীকীর সম্মুখীন হয় এমন কোন শর্তে শান্তি স্থাপন করতে আবো ইচ্ছুক নয়। সুতরাং তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হবে আরবদের পক্ষে বড় পরাজয়, তাহবে হাজার হাজার শহীদ ফিলিস্তিনীর রক্তের সাথে বিশ্বাস্থাতকতার শায়ি। যে বিষ ফৌড়ার সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য এত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আরব জাতির দেহে পচন ধরেছে সেই বিষ ফৌড়াকে সমুলে ধ্বংস করাই মধ্য প্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরবদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পাঞ্চাত্যের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বীর কেশরী সালাউদ্দিন আইউবীর পদাক্ষ অনুসরণ করতে হবে। ইসলামকে রক্ষা নয় ইসলামকে আকড়ে ধরেই নিতিক চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্য পানে।



মামুর দৈশ্যে চালিমি

ফারুক হোসাইন খান

এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক সাহেব দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জল জ্যোতিক, ইসলামের ঝাঙাকে বাতিল ও কুফরের প্রসাদ শীর্ষে উত্তোলন করার আন্দোলনে অমিততেজে এক বিপ্রবী পুরুষ। থার নামে থর থর করে প্রকল্পিত হয় বিশাল ভারতের ব্রাহ্মণ শাসকদের হাদর থেকে প্রাদের ভীত পর্যন্ত। কিন্তু এদেশের এই অগ্নি-পুরুষ, ইসলাম প্রিয় মানুষের মধ্যমনিকে কেন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল? এই বৃক্ষ বয়সে তাকে কেন কারা যন্ত্রণা দেয়া হল? কি ছিলো তার অপরাধ? তিনি কি রাষ্ট্র বিরোধী বা সরকারের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোন কাজ করেছেন? তিনি কি রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, ভাঁচুর চালিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থাকে বৃক্ষাংশগুলি দেখিয়ে আইন-শৃঙ্গলা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, প্রতিপক্ষকে খতম-নির্মূল করার খোগান নিয়ে রাজপথে নেমেছেন নাকি জাতিকে বিভক্ত করার কুমতলব নিয়ে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন যাতে দেশে একটা গৃহ্যুক্ত লেগে যায়?

ইসলামী ঝাঙাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা, ইসলামী আদর্শকে সমুল্লত রাখার চেষ্টা করা বা মজলুম মুসলমানদের পক্ষেকথা বলাইকি তার অপরাধ? কাপালিকদের বাবরী মসজিদ ভাস্ত্রের প্রতিবাদ করাই কি তার দোষ হয়ে গেল?

বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে ও মসজিদ পুনঃনির্মানের দাবীতে তিনি যে লং মার্চ করেছিলেন তাতে গুলি বর্ষণ করে তরতজা মুজাহিদদের খুন ঘরানে হয়েছিল। সেই বাবরী মসজিদ ভাঙার নেপথ্যের নামক

নরসীমা রাওজীর প্রত্যক্ষ মদদে মসজিদ ভাঙার তাঙ্গবের পর পুরো ভারতের হাজার হাজার মুসলমানের রক্তের নদী বইয়ে দেয়া হয়েছে। ভূলগ্নিত হয়েছে অসংখ্য মুসলিম নারীর ইঞ্জৎ। মানবতার মহা দুশমন যে আর্য ব্রাহ্মণ আমাদের স্বজ্ঞাতির এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য দায়ী তার ঘৃণিত ও অপবিত্র পদযুগলকে এদেশের মাটিতে স্থান দিয়ে এদেশের মাটিকে অপবিত্র করতে দিতে চাননি বলে মাওঃ আজিজুল হক সহ বহু নেতা কর্মীকে কারাবন্দ করা হয়। তিনি চানক্যদের গঙ্গার পানি নিয়ে রাজনীতি ও ফারাকা বাঁধকে আমাদের মৃত্যু ফীদে পরিণত করার আর্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোয়হীন ভূমিকা নিষ্ঠিলেন বলে তাকে জেলের অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে বন্দী করা হয়। পার্থিব স্বার্থ ও ব্যক্তি-মর্যাদার পতি লক্ষ করে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মর্যাদাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই এই বৃক্ষ বয়সে তাকে জেলের জুলুম সহ্য করতে হয়। এই একই অপরাধে (।) ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নবীন প্রবীণ আরও বহু নেতাকে বন্দী করা হয়।

কিন্তু কেন এই অবিচার? আমরা কি এতই নিষ্কৃত হয়ে গেছি যে বৃহৎ শক্তি বলে ভারতের অন্যায়ের প্রতিবাদ করারও অধিকার আমাদের নেই। আমরা কি আজীবন ভারতের ইচ্ছের বেদীমূলে বলি হতে থাকব? আমাদের দাস্তিক ও জালিম শক্তির কাছে সর্বক্ষণ মাথা নত করে থাকার আত্মাত্বী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কেন? শাসকের গদীতে আসীন ব্যক্তিগণ আমাদের ভীরুম ও কাপুরুষ করে গড়ে তোলারই বা কোশেশ করছেন কোন উদ্দেশ্যে?

ইসলামের চিরস্তন দাবী, বিশ্বের কোন

অঞ্চলে একজন মুসলমান নির্ধারিত হলেও বাকী বিশ্বের মুসলমানরা তাদের উদ্ধারে জিহাদ ঘোষণা করবে। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক হয়েও আমাদের সরকারের সে দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছে বা সাহস কোনটাই ছিল না। উপরন্তু, মসজিদ ভাঙার ঘটনায় শোকাহত মুসলমানদের দমন করে আমাদের এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, ইয়ান, ইসলাম ও মানবতার পক্ষে কথা বলা মহা অপরাধ। শাইখুল হাদীস সাহেবকে জেপে পুরে পুনরায় প্রমাণ করেছে যে, এদেশে ভারতের অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ও ইসলামের আদর্শ প্রচারকারীর পুরুষার কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ।

তাই স্বত্বাতই প্রশংসন জাগে, আমরা কি ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি যে, তাকে সব ব্যাপারে তোয়াজ করে চলতে হবে? তার ইচ্ছে মাফিক আমাদের আভাসুরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলবে। তার হৃক্ষ ছাড়া এদেশে একটা পিনেরও পতন ঘটবে না? আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা কি ভারতের দাদা বাবুদের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যে তারা আমাদের ওপর মাতৃরি করতে চায়, আমাদের ন্যায় ও সত্য বাক্য উচ্চারণে বাধা প্রদান করতে চায়? বাংলাদেশের স্বাধীনতার কি কোন কানাকড়ি মূল্য নেই কাপালিক ও চাড়াল-চামুণ্ডাদের কাছে?

মুগ্ধ ভারতের শাসন ক্ষমতায় দাস্তিক ও মানবতা বিবর্জিত ব্রাহ্মণের আসীন থাকায় তারা যে পরিমাণ না দস্ত দেখায় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দস্ত দেখাতে আমরা উৎসাহিত করি, সুযোগ করে দেই। এদেশের আলো, বাতাসে লালিত পালিত এক শ্রেণীর 'বলে মাতৃর' ভক্ত ও ইঙ্গিয়ান

ব্রাহ্মণদের উচ্চিষ্ঠ তোজীরা এদেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার তোড়-জোর করায় তাদের উচ্ছিষ্ঠের মাত্রা বেড়ে গেছে। এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর কাপালিকদের চাপিয়ে দেয়া সকল প্রকার হস্তক্ষেপ প্রশাসনের মধ্যমনিরা অবস্থানক্রমে মেনে নেয়ায় এবং তাদের সকল প্রকার অবৈধ ইচ্ছার নিকট আমাদের সরকার নতজানু ভূমিকা পালন করায় দাদা বাবুরা আমাদের সিকিম, ভূটান ঠাওরাছে।

এরই নামকি স্বাধীনতা, একেই কি বলে জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেম? নিজের মনের কথাটি যদি দাঙ্গিক শক্তির ভয়ে বলতে না পারলাম, নিজের পথে চলতে যদি তত্ত্ববিদের ভয়ে হাটু ঠকঠক করে, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে যদি বুক কাঁপে, মুখে তালা ঝুলিয়ে দিতে হয় তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কোথায়? এমন ভীত কাপুরুষোচিত কার্যকলাপ কি দেশপ্রেম না দাসত্ব? স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল না পাওয়া গেলে সে স্বাধীনতার আদৌ কি প্রয়োজন আছে?

দেবতার আসনে বসে যারা দেশ শাসন করে তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। তারা শুধু শাসনই করে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। ব্যক্তি চিন্তার কাছে জনতার মতামতের কোন মূল্যই তাদের কাছে নেই। তারা ভূলেই বসে আছে যে, আমরা মুসলমানরা সেই সব জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যারা নিজ নিজ ধর্মকে বিকৃত করেছে ব্যক্তি স্বার্থ ও পার্থিব স্বার্থ হস্তের জন্য ধর্মকে অপব্যাখ্যা ও শোষনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। স্বার্থের কাছে ধর্ম একান্ত তুচ্ছ, কিন্তু সাজ্জা মুসলমানদের নিকট ইমান, ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। জালিম যত বড় শক্তিই হোক তার কাছে মাথা নত করা মুসলমানের ধর্ম নয়। ভীরুত্বা ও কাপুরুষতা তাদের কাছে একান্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। ইসলাম একদিকে শাস্তির ধর্ম প্রয়োজনে

শক্তিরও ধর্ম। ভৌগলিক সীমা, রাষ্ট্র, বর্ণ প্রথা ইসলামে একেবারে অচল। তাই বিশ্বের এ প্রাণের মুসলমান অন্য প্রাণের বিপদগ্রস্থ মুসলমানের পাশে দাঢ়াতেও কুর্সিত হবে না।

ইমানের এই দাবীকে বাস্তবায়িত করার জন্য যত বাধাই আসুক তা 'সে উপেক্ষা করবেই। আমাদের জাতীয় নীতি নির্ধারকদের এই ইমানী চেতনার অভাবে ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রতিবাদ করায় মুসলমানের হাতে মুসলমানরা নির্যাতিত হওয়ার মত লজ্জাক্ষর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। ইসলামের ইতিহাসের উজ্জল জৌতিক আজম ইমামে হয়রত আবু হানিফা (রহঃ), হয়রত আনাস ইবনে মালেক (রহঃ) ও হয়রত আহমদ ইবনে হাথল (রহঃ) প্রমুখ বাস্তিসহ যুগে যুগে অস্থির মুসলিম মনীষী ইসলামের আদর্শের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলিম শাসকদের রোষালে পড়ে কারাগারে নির্যাতন তোগ করেছেন বছরের পর বছর ধরে।

ইতিহাস কিন্তু ন্যায় বিচার করতে ভুল করেনি। ইসলামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন তোগ করেছেন তা' যুগে যুগে মুসলমানদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হাজারো কষ্ট স্থীকারে প্রেরণ যুগিয়েছে। পক্ষান্তরে, তাঁদের ওপর জুলুমকারীরা জালিম হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছেন। দুর্ভাগ্য মানুষের শিক্ষা নেয়ার জন্যই ইতিহাস রচিত হলেও আমাদের সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক বলে মনে হয় না।

সুতরাং এই দেশের ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা যারা চিহ্নিত এই মুহূর্তে তা' আগ্রাসী শক্তির থাবা থেকে মুক্ত রাখতে তাদের বালিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। শায়খুল হাদীস জনাব আজিজুল হক সাহেবের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয়, জাতি ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তির ন্যায় আর কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে দেশের ও জাতির পক্ষে কথা বলার জন্য হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার না হতে

হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আমরা স্বাধীনতাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, মনের ভাষাকে প্রকাশ করতে চাই কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়। কোন দাঙ্গিক শক্তি আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে যদি পুতুল খেলায় মন্ত হতে চায় তবে তার অশুভ হাত দুটোকে ডেঙ্গে দিতে দয়ার দুর্বলতা দেখাতে রাজী নই। আমরা বুক ঝুলিয়ে আমাদের ইমানী অস্ত্র চালিয়ে দাঙ্গিক শক্তিকে ঝাঁঝরা করে দিতে মোটেই অক্ষম বা ভীত নই। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, কার বাপের সাধ্য আমাদের সে অধিকারে নাক গলায়। হাজার বছরের গোলামীর চেয়ে একদিনের স্বাধীন জীবনও আমাদের কাছে মহা মূল্যবান।

অতএব স্বাধীনতার এই অমিয় মন্ত্রে আমাদের উজ্জিবীত হতে হবে, দেশ প্রেমের নব চেতনা নিয়ে আমাদের সীমা ঢালা প্রতিরোধ প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতার বিরোধী আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এদেশী দোষের শব্দন-শকুনীদের নাকের ডগার ওপর। কোথায় সেই অকৃতোভয় স্বদেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের কাফেলা?

এই বাংলাদেশের আলো বাতাসে সালিত পালিত হয়ে, বাংলার বুকে জন্ম নিয়ে একটি মহল বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করছে। মদীনার ইসলাম, রাসূল-সাঃ-এর ইসলাম, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের ওপর ছুরি চালিয়ে, ইসলামের অপরিহার্য ডালপালাণগোকে ছেটে ছুটে মোহল দানব আকবরের 'দ্বীনে ইলাহী' কিসিমের এক নতুন দণ্ড-মুণ্ডীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে সরল সহজ মুসলমানদের ইমানকে হরণ করার পায়তারা করছে উক্ত মহল। এদের পূর্ব সূরীয়া যুগে যুগে আদুল্লাহ বিন উবাই এর ভূমিকা পালন করে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এরা মোনাফেক, জাতির গাদার

হিসেবেই সুপরিচিত। এরা মুসলিম নামে মুসলিম সমাজের মধ্যে মিলেমিশে থেকে ইসলামের শক্তির এজেন্ট হিসেবে বিভীষণের ভূমিকা পালন করত। সেই মোনাফেকে গোষ্ঠীর এদেশীয় সার্থক উত্তরাধীকারী হলো সেকুলার এবং বামপন্থী হিসেবে পরিচিত মহলদের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম নামাবলী অলংকৃত আদম সন্তানগণ। এরা এই মুসলিম দেশেটিতে পাকাত্য থেকে ধার করে আনা সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নতুন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদিটি পাকাত্যের জঠর থেকে উগিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভূমিত্ব হয়। এর জন্মদাতারা যখন এটি জন্ম দেন তখন ইউরোপে আন্তিকতা ও নান্তিকতা নিয়ে চলছিল প্রচণ্ড বিতর্ক। খৃষ্টধর্মে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় গীর্জার পাদ্রীরা খেয়াল খুশিমত আইন করে ইশ্বরের দোহাই দিয়ে জনগণকে শাসনের নামে উৎপীড়ন চালাত। তাদের শোষণের যাতাকলে পৃষ্ঠ হতে হতে এবং ধর্মকে বিজ্ঞান ও প্রগতির ঘোর বিরোধীর ভূমিকায় দেখে এক সময় ইউরোপের পুরো খৃষ্টান সমাজ ধর্মের প্রতি বীতশুন্দ হয়ে পড়ে। ইশ্বরের দোহাই দিয়ে পাদ্রীদের যুগ যুগ ধরে শোষনের ফলে এক সময় তারা ইশ্বরের অস্থিতি নিয়েও শংসয় প্রকাশ করতে শুরু করে। ক্রমে শংসয়বাদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায়; তারা একসময় সকল অনাচার ও নিপীড়নের হোতা ইশ্বর-পুত্র পাদ্রীদের কার্যকলাপ গীর্জার চার দেয়ালের মধ্যে সীমিত করে দেয়। জেকব, হলিয়ক, ব্রেডলাক, সাউথ ওয়েল, থমাস কপার প্রমুখ দার্শনিকদের থিউরি অনুযায়ী এবং পরবর্তিতে আরও বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রবক্তাগণের দলাই-মালাই, ঘষা-মাজার পর রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের প্রতাবহীন আধুনিক সেকুলারিজম। এর মূল

কথা হল 'রাষ্ট্র তার রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন হবে ধর্মের প্রভাব মুক্ত। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবেন। রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি ও প্রশাসন এসব ইহজাগতিক ব্যাপার-স্যাপার। সুতরাং এগুলো ইহজাগতিক আইন-কানুন, নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হবে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। ধর্মের লক্ষ্য পারলোকিক মুক্তি। সুতরাং তা ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'

সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত ধর্মহীন সিলেবাস অনুযায়ী লেখাপড়া করে বৃদ্ধজীবী বনে যাওয়া এদেশীয় মুসলিমানের সন্তানেরা বেশ ভাল করেই রঞ্জ করে নেয় পাকাত্যের এই উত্তৃট ও ধর্ম বিরোধী বক্তব্যকে। ওরা পাকাত্যের আন্তিকতা ও নান্তিকতার মধ্যে সংঘাতময় পরিবেশের ছাচে ফেলে ইসলামকে বিবেচনা করতে থাকে, মুসলিমানদের ধর্মীয় মনীষীদেরকে মৃল্যায়ন করতে থাকে পাকাত্যের শয়তানের প্রতীক প্রাদুর্বাদের কভারে ফেলে। সড়া-সমাবেশ, মিছিল মিটিং সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও প্রচার মাধ্যমে যখনই সুযোগ পায় গলাবাজী করতে থাকে "মৌলবাদ নির্মূল কর, ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ কর, মসজিদে রাজনীতি বন্ধ কর, রাজনীতি থেকে মসজিদের পরিত্রাত্ব রক্ষা কর" ইত্যাদি। কিন্তু ওরা ক্ষুণ্ণরেও একটু মাথা ঘায়ায়নি যে, সেকুলারিজমের উৎপত্তি হয়েছে পাকাত্যে। পাকাত্যের ধর্মান্ধ্য ও স্বার্থান্ধ্য পাদ্রীদের অপকর্মের ফলে সৃষ্টি সমস্যার সমাধানের জন্যই সেকুলারিজমের উৎপত্তি। ইউরোপের যে সমস্যার জন্য এর জন্ম আমাদের দেশে তেমন কোন সমস্যা নেই। ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী নয়। এদেশের সেকুলার বৃদ্ধজীবীরাও সড়া-সেমিনারে দাবী করেন যে, "একদল ধর্ম ব্যাবসায়ী ধর্মের নামে ব্যবসা করে এবং ধর্মের নামে রাজনীতি করে, মসজিদসহ সকল ধর্মীয়স্থানের পরিত্রাত্ব নষ্ট করে, জনগণকে শোষণ করে।

কিন্তু ধর্ম পরিত্র জিনিস, রাজনীতির সাথে একে মিলিয়ে ফেললে ধর্মের, ধর্মীয় স্থানের পরিত্রাত্ব নষ্টহয়।" "ইসলাম ধর্ম পরধর্ম সহিষ্ণু, অন্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করে না" ইত্যাদি।

সুতরাং ইসলামের পর-ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে যারা এত সুন্দর ফতোয়াবাজী করেন তারা কেন সেই ইসলামকে বাদ রেখে পাকাত্যের একটা মনগঢ়া মতবাদ কায়েমের ঠিকাদারী নিয়েছেন। তাদের ভাষায় ইসলামের ন্যায় পরিত্র জিনিসটা নিয়ে কিন্তু সংখ্যক দুষ্ট লোক ব্যাবসা করেন, শোষন করেন, মসজিদের পরিত্রাত্ব নষ্ট করেন। কিন্তু তারা কেন ধর্মের মত পরিত্র জিনিসটা ঐ সব খারাপ (!) লোকদের নিকট থেকে ছিন্নে নিষ্কেন্দ না? কেন ধর্মকে খারাপ লোকদের হাতে ব্যবহৃত হতে দিষ্কেন্দ? আসলে রাজনীতি কি একটা মহা অপবিত্র জিনিস যা ধর্মের সাথে মিশালে ধর্মকেও অপবিত্র করবে, মসজিদের পরিত্রাত্ব নষ্ট হয়ে যাবে? তাহলে এমন মহা অপবিত্র জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তারা নিজেদের কেন সমাজের চোর ডাকাতের ন্যায় 'দাগী' হিসেবে চিহ্নিত করছেন, তাপো মানুষরা কি অপবিত্র জিনিস পছন্দ করতে পারে?

ওদের কাছে এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। ওদের মন-মানসিকতা অন্যের কাছে বাধা। ভাল মন বিবেচনা করার ওদের নিজের কোন জ্ঞান নেই। ওদের মিশনই হল পাকাত্যের প্রভূদের সেকুলারিজম আমদানী করে তার বাংলা তরজমা এদেশে কায়েম করা। ওরা নিজেদের তথাকথিত গণতন্ত্রের পোদার বলে জাহির করে যে, গণতন্ত্রে নাকি সকলের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতার কথাও বলা হয়। ওনারা সে গণতন্ত্রের কথা বলে সমাজতন্ত্র ও ধর্মবিরোধী একটা মতবাদ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে গলাবাজী করতে পারলে ধর্মের ভিত্তিতে কেউ রাষ্ট্র ও সমাজ

গঠন করার মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন না কেন? তাদের অপরাধ কি তাদের 'মৌলবাদী' 'প্রগতি বিরোধী', 'পশ্চাত্পদ', ধর্ম ব্যবসায়ী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাদের কঠ রোধ করার নির্মূল করার অগণতাত্ত্বিক তৎপরতা চালানো হয় কেন? ধর্মনিরপেক্ষতার নট-নটীরা জবাব দিবেন কি?

পাঞ্চাত্যের অধিকাংশ সোকজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, পরকাল সম্পর্কে তারা একেবারেই নির্বোধ। তাছাড়া খৃষ্টধর্মকে আধুনিকী করণের সময় পাদ্মীরা পুরো খৃষ্টজগতের সামনে একটা ধারণা পেশ করে যে, "যিষ্ঠ খৃষ্ট শুল্পে চড়ে আত্মাগ করেছেন পুরো খৃষ্টান সম্পদায়ের দ্বারা সংগঠিত অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল পাপরাশির প্রায়চিত্ত করার জন্য। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন খৃষ্টান হাজারো পাপ করলেও তা আর পাপ বলে বিবেচিত হবে না। ঈশ্বরের দরবারে ত" আগেই মোচন হয়ে গেছে।"

পাঞ্চাত্য জগত এই উভয় ধর্মসাত্ত্বক ধারণার বশবর্তী হয়ে পাপের কোলে নিজেদের সপ্তে দিয়েছে। খেয়াল খুশিমত রাষ্ট্র ও সমাজকে শাসন-শোষণ করার দণ্ড হাতে তুলে নিয়েছে। জীবনকে তারা দৃঢ় ভাগে ভাগ করেছে। এক ইহজাগতিক ও অন্যটি পারলৌকিক। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এসব কর্মকাণ্ড ইহলৌকিক এবং ব্যক্তিগত ধর্ম পালন এটা পারলৌকিক। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক তৎপরতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যক্তিকে পরাকালে কোন জবাব দিতে হবে না। কিন্তু ইসলাম কি ঐসব খৃষ্টান মতলববাজদের সাথে একমত? হাদীসে আছে, "দুনিয়া হচ্ছে পরকালের কর্মক্ষেত্র। মানুষ দুনিয়ার কর্মফল পরকালে ভোগ করবে।" সুতরাং একথা কি বলা যায় যে, মানুষ শাসক হয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে দুর্বলকে হত্যা করবে, প্রশাসনে থেকে ঘৃষ-দুনীতি, ব্যতিচার-অশ্বিলতা,

মদ্যপান করবে কিন্তু আল্লাহ এর কৈফিয়ত চাইবেন না বা চাইতে একেবারেই অক্ষম?

ইসলামে কি কাউকে প্রতু সেজে, আইন করে অন্য মানুষকে গোলামের ন্যায় শাসন করার অধিকার দেয়া হয়েছে? ইসলামের দ্বিতীয় রোকন যাকাত—যা আদায় করা সম্পর্কে কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের শাসন কর্তা ধর্মীদের নিকট ধেকে যাকাত আদায় করবেন এবং এভাবে রাষ্ট্রের অধিনিতির মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখবেন। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অনুসৃত অধিনিতির কাঠামোতে যাকাত উপেক্ষা করা হয়। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চোরের হাত কাটা এবং ব্যতিচারের জন্য বেত্রায়াত বা প্রস্তরায়াতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যা" ইসলামী সরকার না থাকলে কার্যকর করা সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে একে অমানবিক ও মধ্যবুংগীয় বর্বরতা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত।

বোধগম্য নয় যে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান উল্লেখ থাকার পরও এ দেশীয় সেকুলার পণ্ডিতরা কোন প্রত্যাদেশের জোরে ইসলামকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ফতোয়া দিচ্ছে। নিজেরা ইসলামের ফরজ বিধান অস্থীকার করছে অন্যকেও অস্থীকার করতে উদ্বৃদ্ধ করে তাদের ঈমান সুটে নেয়ার তৎপরতা চালাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মদ্যনার মূল ইসলামকে রাষ্ট্র ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তাদের 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে যে, এদের চিন্তা চেতনা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। মদ্যনার মুহাম্মদ (সা):—এর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এ যুগের জন্য একটা মন্তব্ধ অপরাধ!

সেকুলার পন্থীরা যাতই ধর্মের দোহাই পারলে, ইজ্জ করম্বক আর নামাজ পড়ুক ওরা মূলতঃ ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন, ওদের তৎপরতা ইসলামের মৌলিক

অতিত্বের জন্য ধর্মসাত্ত্বক। আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (মায়েদা: ৩)

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোন ঘুমে নারী—পুরুষের কোন ইঁতিয়ার থাকে নাম।" (আল আহয়াব: ৩৬)

"আল্লাহর নায়িল করা যাবতীয় বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের, যাদের তারা ফাসেক।" (সূরা মায়েদা: ৪৪-৪৭)

"ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান।" (আলে ইমরান: ১৯)

"ইসলাম ব্যক্তীত যদি কেউ অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ কখনও তা' প্রহণ করবেন না।" (আলে ইমরান: ৮৫)

সুতরাং ইসলামকে শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবনের গভীতে আবক্ষ করার চেষ্টা আল্লাহর উল্লেখিত ঘোষণার সরাসরি লংঘন। আল্লাহ আমাদের পূর্ণাঙ্গজীবন যাপন করার জন্য আল কুরআন প্রেরণ করেছেন। রাসূল (সা:) এই পবিত্র গ্রন্থখানাকে সংবিধান করে ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব কাঠামো তৈরী করে সে অনুযায়ী আমাদের পথ চলার নির্দেশ করেছেন। অতএব আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, আল্লাহ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন করার বিধান তৈরী করতে পারলেন, পরকালে এর কৈফিয়ত নেয়ারও ব্যবস্থা রাখলেন কিন্তু মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজের বিধান দেয়ার সামর্থ তাঁর ছিল না এবং পরকালেও এর কৈফিয়ত নিতে পারবেন না!

সর্বশেষে বলতে হয়, সেকুলার মতবাদ ইসলাম সমর্থিত নয়। এর জন্মদাতা পাঞ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টানেরা। তাদের

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বঙ্গু মনে করে তাদের মতবাদকে তারাই গ্রহণ করবে যাদের চরিত্র স্বয়ং আল্লাহই ভুলে ধরেছেন, “হে ঈমানদারগণ; ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বঙ্গু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করোনা। এরা নিজেরা পরম্পর বঙ্গু ও পৃষ্ঠপোষক। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বঙ্গু ও পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করে তবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।” (মায়েদা-৫১)

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে যারা ইসলামের জন্য আন্দোলন করছেন এবং খাতি ইসলামের পথে যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আমাদের সেকুলার পশ্চিতরা মৌলবাদী বলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখছে এবং ভারত আমেরিকা, রাশিয়ার ন্যায় ইসলামের দুশমন রাষ্ট্রগুলির সাথে গলাগলি বেঁধে তারা কুরআনের এই সত্যকেই প্রমাণ করছে।

অতএব আল্লাহ প্রেরিত ইসলামের সুগভীরমূলের সাথে সম্পর্কিত ও আস্থাশীল সত্যিকার ‘মৌলবাদীদের’ সচেতন হতে হবে, ইসলামের ঘরের শক্তি বিভীষণদের ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে ইসলামের অঞ্চল রক্ষা করতে প্রস্তুতি নিতে হবে। ওদের চিহ্নিত করে সরল সহজ মুসলিমদের ওদের ধোকা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করতে হবে। সারা বাংলার অলিতে-গলিতে, পথে-পাস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, “সেকুলারবাদীয়া ইসলামী সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র; যাকাত, ইসলামী শরিয়ত ও জিহাদে বিশ্বাস করেন না।

ওদের এ মোনাফেকী তৎপরতার বিরুদ্ধে রংখে দাঢ়ান্তোর জন্য বাংলাদেশের আপামর মুসলমানকে জিহাদের দাওয়াত পৌছে দিতে হবে। ঈমানী চেতনার এত ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ করতে হবে যাতে ওরা চারিদিকে মৌলবাদী ছাড়া আর কিছু না দেখতে পায়। ‘মৌলবাদী’ ‘মৌলবাদী’ চিৎকার করতে ঘটাতে যেন ওরা দম বক্ষ হয়ে

গতায় হয়। কোথায় আছে সেই মৌলবাদের ঝাওঁধারী প্রথম কাফেলা? সময় এসেছে এবার উড়াও তোমার ঝাওঁ।

করে এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য হাজারো চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে হবে। পৃথিবী আজ দুটি দলে বিভক্ত। এক হিয়বুল্লাহ আর অন্যটি হিয়বুশ শয়তান। হিয়বুশ শয়তান সর্বদাই সুযোগ সঞ্চালনী এবং ঈমানদারদের ধ্বংস করতে তৎপর। আধুনিক ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তি হিয়বুশ শয়তানেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের হাত থেকে ঈমান, ইসলামকে রক্ষা করতে হলে হিয়বুল্লাহকে অবশ্যই প্রতিরোধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ঈমানদার ও শয়তান কথমে এক পথে চলতে পারে না; তাদের মধ্যে কোন সমরোচ্চ হতে পারে না। ধ্বংস অথবা বশ্যতাই হিয়বুশ শয়তানের ভাগ্যের অংশগুলীয় সেখা। আল্লাহ ঈমানদারদের হাতেই তাদের শাস্তি দিবেন।

ইয়ালুদী চক্রান্তের কবলে

(১১ পৃঃ পর)

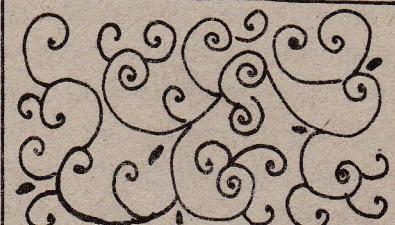
মিশর, উগান্ডা, তিউনিসিয়া, জর্ডান, লেবাননে হাজারো সন্তানী হামলা চালিয়েছে। ইরাকের পারমানন্দিক প্রকল্পে ১৯৮১ সালে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর উথানের আশংকায়। মুসলিম জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা শাহ ফয়সালকে হত্যার পেছনে রয়েছে ইহুদী চক্রান্ত। ইহুদী সংস্থা মোসাদ সারা বিশ্বে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলোকে টেনিং দিচ্ছে। কাশীরে মুজাহিদ দমনে মোসাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে এবং ভারতীয় বাহিনীকে টেনিং দিচ্ছে। শ্রীলংকার তালিম বিদ্রোহীদের তামিল মুসলিমদের হত্যার ইঙ্কন যোগাচ্ছে তাদের টেনিং দাতা মোসাদ। বার্মায় রোহিঙ্গা বিভাড়নে বর্ষীবাহিনীকে টেনিং দিচ্ছে মোসাদ। বসনিয়ায় মুসলিমদের হত্যার জন্য সার্বদের টেনিং দেয়াসহ তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে এই মোসাদের গোয়েন্দার। যেখানেই ইসলাম বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে ইহুদীদের চরেরা সেখানেই উপস্থিত হচ্ছে। ইদানিং এই দেশে ইসলাম বিশ্বে নান্তিরদের ইসলামী আন্দোলন ঠেকানোর কসরতের জন্য যে উগ্রবাদী সংগঠনটি গজিয়ে উঠেছে তার জন্মদিনেও একজন মার্কিন ইহুদী টমাস টিকিটিং এটনীর আইডেন্টি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ ইহুদী চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, আরববাদ প্রত্যু বিভাসির মাধ্যমে তারা মুসলিম বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে বিনষ্ট

উদয়ঘোষা

(৮ পৃঃ পর)

উদযাপন করি, সে সময় বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলিমান ভাই-বোনেরা নমরদী শক্তির হাতে যবেহ হতে থাকে। ঈদুল আয়হার কোরবানী অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে, প্রতিটি কোরবানীদাতাকে আগে নিজের খোদাদোহী ও স্বার্থপর কুপ্রবৃত্তিকে কোরবানী দিয়ে নিজ সমাজ থেকে আল্লাহর অব্যাধাতাজনিত অন্যায়-অবিচারকে উৎখাত করতে হবে এবং হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর ন্যায় ঈমানী তেজ, সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নমরদী পশ্চত্ত্বের হাত থেকে মানবতাকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে বীচত হবে।



কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

আমি স্বচক্ষে দেখেছি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর আমীর এসময় কাশীরের বাইরে ভারতের অন্যত্র সফরে ছিলেন। আজমল তার সফর সংগী। ফোনে তারা আমার পৌছার খবর পেয়ে সফর সংক্ষিপ্ত করে শ্রীনগর ফিরে আসে। আমরা এক গোপন মিটিংয়ে কেন্দ্র থেকে দেওয়া প্রোগ্রাম নিয়ে পরামর্শ বসি। তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখানে একটি পরিপূর্ণ টেনিং ক্যাম্প খোলা হবে। সেখানে সকল সাথী একত্রিত হওয়ার পর পরবর্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

হরকাতের আফগানিস্তানের টেনিং ক্যাম্প অনেক কাশীরী মুজাহিদ টেনিং নিয়ে কাশীরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারা ইতিমধ্যে বহু সফল অভিযানে অংশ নিয়েছে। তবে বিশেষ কারণে তারা তাদের সংগঠনের নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত রয়েছে।

এবার নতুন সেন্টারে পুরাতন সাথীদের সাথে সাথে নতুন সাথীদেরও আফগান ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে টেনিং চলছে। কখনও দৌড় ঝাপ, কখনো অস্ত্রের টেনিং যুদ্ধের মহড়া এর পর কুরআন ও ইমান আবিদা বিষয়ক দরস। সাথে সাথে পাহারাদারী ও মরিচা খেদাইও করানো হচ্ছে। তোর রাতে সেজদায় পড়ে হৃদয়ের সমষ্টি আকৃতি দিয়ে আল্লাহর কাছে বারা কাটি করা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সর্ব প্রথম টেনিং সেন্টারের হেফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং এক ডাকে সব মুজাহিদ কমাণ্ডারের কাছে জ্ঞা হই। চতুর্দিকে দূর পর্যন্ত মরিচা খোদাই করা হয়। টেনিং

ক্যাম্পে যাওয়ার পথের দুই ধারে ওয়ারলেসেসহ কড়া পাহারা বসান হয়েছে। অর দিনের মধ্যেই টেনিংয়ের কাজ পুরো দমে শুরু হয়। দেখতে দেখতে সকল পুরাতন সাথী সেন্টারে পৌছে যায়। আমাদের টেনিংয়ের ধরণ দেখে অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপ দলে দলে তাদের সাথীদের আমাদের কাছে পাঠাতে শুরু করে। মুজাহিদদের অধিকাংশ গ্রুপ থেকে আমাদের মারকাজের প্রশিক্ষণ ও শুভ্রালার জন্য ভূয়সী প্রশংসন পত্র আসতে থাকে। মৃশত আমরাই (হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী) সর্ব প্রথম কাশীরে পরিপূর্ণ টেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই।

টেনিংয়ের প্রোগ্রাম গতিশীলভাবে এগিয়ে চলছিল। এমন সময় পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে ক্রেক ডাউন হয়। এবার এই ক্রেক ডাউনে অংশ নেয় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ। তারা গ্রামের এক ছেলেকে ধরে মার পিট করলে সে তাদেরকে বলে দেয় যে, আমাদের এখানে কিছু আফগান মুজাহিদ ঘোরা ফিরা করছে। তার কথামত একজন গুপ্তচরসহ রিজার্ভ পুলিশের সদস্যরা আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। তাদেরকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে দেখে আমাদের পাহারাদার সাথী ওয়ারলেসের মাধ্যমে ত ঝক্কণাং আমাদের নিকট সে খবর পৌছিয়ে দেয়। এ খবর শুনে ক্যাম্পের মুজাহিদরা খুশীতে আটখানা। বহুদিন ধরে তারা এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গলা জড়িয়ে একে অন্যকে তারা মোবারিকবাদ জানিয়ে বলে, ওদেরকে এমনই শিক্ষা দেওয়া হবে যে, কাশীর জবরদস্তি দখলে রাখায় কত মজা তা আজ বুঝিয়ে দিতে হবে। একটি লড়াইয়ের জন্য সকল প্রস্তুতিসহ সবাই অপেক্ষা করছে। শিকার নিজে এসে

ধরা দিচ্ছে বলে ব্যাস্তভাবে সবাই মরিচা সামলানসহ প্রতিরোধ শক্তি ম্যবৃত করতে থাকে। স্থির হল, তাদেরকে ক্যাম্পের মধ্যে ঢোকার পর ঘেরাও করে সব খতম করা হবে। কাউকে জিন্দা ফিরতে দেওয়া হবে না।

এদিকে গ্রাম থেকে এক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর ভাড়াটে গুপ্তচর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? তারা বল্লো, এখনকার আফগানী ক্যাম্পে আমরা হামলা করব। এ কথা শুনে সে বিশ্বের সাথে বল্লো, “সে কি করে সত্ত্ব? আপনারা সংখ্যায় এত কম আর আফগানীরা সংখ্যায় অনেক। উপরস্থু তাদের রয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ। তারা মারকাজে সর্বাধুনিক মারণাত্মক তাক করে রেখেছে। আমার মনে হয়, সেখানে গেলে কেউ জেন্দা ফিরে আসতে পারবে না। রিজার্ভ পুলিশের এই গ্রুপ কাশীরে এই নতুন এসেছে। তারা কিছু একটা করে নিজেদের বাহাদুরী জাহির করতে চায়। তারা বল্লো, কোন চিন্তা করো না, আমাদের সাথেও দেড় হাজার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিপাহী আছে। তাহাড়া আফগানীরা অন্যদেশ থেকে এসেছে। মানসিকভাবে তারা বহু দুর্বল। এখানে তারা আজ্ঞা বল নিয়ে লড়ার সাহস পাবে কই? রিজার্ভ পুলিশ আরো অগ্রসর হলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা তা জানতে পেরে গাড়ি নিয়ে সরাসরি তাদের সামনে এসে রাস্তা রুখে দৌড়ায়। তারা বলে, ক্রেক ডাউন শেষ হয়েছে এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যান। তবুও তারা অগ্রসর হতে চাইলে সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা বলে এই ক্যাম্পে হামলা করতে হলে পাঁচ সাত হাজার সৈন্যসহ

আরও বহু আধুনিক অস্ত্রের দরকার।

অগ্রজ্য তারা ফিরে গেল। যাওয়ার পথে গ্রামবাসীদের বলে গেল, তোমরা আফগানীন্দেরকে অন্ত সমর্পণ করতে বলো, অন্যথায় তাদের বাঁচার হিতীয় কোন পথ নেই। একথা আমরা জানতে পেরে জবাবে বলা হলো, আমরা দশদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো। আমরা মারকাজ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বাইরে এসে তোমাদের সাথে লড়াই করবো। তোমরা যত সৈন্য ও মারণাস্ত্র নিয়ে আসতে পার আস। এই প্রয়াম দুশমনদের এত ভীত করে দিয়েছিল যে, দশ দিন পর্যন্ত তারা এদিকে পা-ই বাড়ায় নি। এদিকে আর একটা আশ্চর্জনক ঘটনা ঘটে যায়। ক্রেক ডাউন তুলে সৈন্যরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাঁচজন সশস্ত্র মুজাহিদ ওই রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পের দিকে আসছিল। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তারা রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকে। গাড়ি চলে যাওয়ার পর রাস্তার উপর উঠে হরকাতুল জিহাদের নির্ভিক মুজাহিদরা সামনে আগতে থাকে। “সামনে চল” এই রণ সংগীত তারা কোরাস গলায় গাইতে গাইতে রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে থাকে।

ওই গাড়ির পিছনে আর একইট গাড়িতে একশ চল্লিশজন সিপাহীর একটি পদাতিক দল থেঁয়ে আসছিলো। পাঁচজন মুজাহিদকে দেখে তারা রাস্তার দুপাশে লুকিয়ে যায়। তাদের অতিক্রম করে পিছনে ফেলে আসার পর একজন মুজাহিদ পেশাব করতে বসার পূর্বে পিছনে তাকিয়ে দেখে, সৈন্যরা রাস্তার নিচে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সাথীদের ডাক দিয়ে এখবর দিলে এক জন মুজাহিদ অপেক্ষা না করে তাদেরকে সংক্ষ করে শুলি ছুড়লে সাথে সাথে চার-পাঁচ জন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারা হতাহতদেরকে তুলে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

আমরা পরে গ্রামবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমাদের মাত্র পাঁচজন মুজাহিদকে

দেখে তারা ভয়ে পালালো কেন? গ্রামবাসীদেরকে তারা বলেছে, তাদের জন্য পাঁচজন মুজাহিদের সাথে লড়াই করা কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাদের ভয় হচ্ছিল, যায়ারের আওয়াজ শুনে পার্শ্ববর্তী মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে মুজাহিদরা সাড়শী আক্রমণ করলে তখন তারা কেউই যে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না! দ্বিতীয়ত তাদের অন্যসব গাড়ি আগে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধে নাকি তাদের পরাজয় ছিল নিশ্চিত। তাই বৃহৎ কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মুকাবিলায় তুলনামূলক অল্প ক্ষতি বরণকে তারা মেনে নিয়েছি। পালিয়ে জীবন বাঁচাতে পারাটাও কোন ছেট বিজয় কি? উপরত্ব যথবৃত্ত প্রশিক্ষণ প্রাণ পরিষ্কৃত চোকস আফগান মুজাহিদদের সাথে লড়াই করার হিমে তাদের হয় না।

তারতীয় সেনাদের আহবান মতে বিশ দিন পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। তাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এমনকি তাদের এদিকে আসার কোন লক্ষণ না দেখে কোশলগত কারণে আমরা আমাদের টেনিং সেন্টারটি স্থানান্তরিত করি।

আল্লাহর উপর তায়াকুল করে আমি পূর্ণ আস্তার সাথে বলতে পারি, যদি সেনিল তারতীয় রিজার্ভ পুলিশ আমাদের উপর হামলা করতো তবে তারা একজনও জিন্দা ফিরে যেতে পারতো না।

নতুন যায়গায় টেনিং সেন্টার স্থাপনের সাথে সাথে চারিদিক থেকে বিভিন্ন সংগঠনের মুজাহিদরা টেনিং নিতে এখানে আসতে শুরু করে। এখানে বিভিন্ন টেনিংয়ের সাথে সাথে দীনি তালিমেরও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদরা আমাদের নিয়ম পদ্ধতি ও ক্যাম্পের দীনি পরিবেশ দেখে অগ্রহের সাথে আমাদের সংগঠনে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। আমরা সব সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সাথে তাদেরকে নিজ নিজ দলে থেকে কাজ

করার পরামর্শ দেই।

এর ফলে সকল সংগঠনের কাছে আমরা পরম শুন্দর পাত্রে পরিণত হই। একবার আমাদের সেন্টারের দিকে ইভিয়ান সৈন্যরা চুপে চুপে অগ্সর হতে থাকলে “আল ওমরের” মুজাহিদরা তাদের দেখতে পায়। সৈন্যদের গতি দেখে তারা বুজতে পারে, আমাদের দিকেই অগ্সর হচ্ছে। আমাদের খবর না দিয়েই জীবনের ঝুকি নিয়ে পথিমধ্যে তারা সৈন্যদের গতিরোধ করে। এ লড়াইয়ে ‘আল ওমর’ প্রশংসনের চারজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। চারজন মুজাহিদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের ক্যাম্প রক্ষা পায়।

টেনিংয়ের কাজ চলছিল। এক ব্যাজ শেষ হতেই নতুন ব্যাজ শুরু হয়। এভাবে বহুমুজাহিদ ক্যাম্পে জমা হয়। তাদের আন্তরিক দাবী হলো আক্রমণ শুরু করা হোক। আমরা শুরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলাম এখন থেকে নিয়মিত আক্রমণ চালানো হবে। তবে আক্রমণের ধরণ এমন হতে হবে, যাতে আমাদের প্রভাব তাদের প্রতি আরও বৃদ্ধি পায়। দুশমনের হৃদয় থেকে আমাদের প্রভাব এতটুকু কমে না যায়। এসময় তারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে অপারেশন টাইগারে শরীক সৈন্যদের প্রতি ক্ষেপ্ত্রের নির্দেশ ছিলো, যে মহস্তা থেকে তোমাদের প্রতি শুলি ছোড়া হবে সে মহস্তা পুড়িয়ে ধূংস করে দিবে। আমরাও ঠিক করলাম, কোন হাম বা মহস্তা থেকে উদের প্রতি আক্রমণ করব না। বরং খোলা ময়দানে আমরা ওদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব।

ছুরাহ পুলিশ টেশনের উপর আক্রমণঃ

শ্রীনগরে ছুরাহ ইনষ্টিউট নামক একটি বড় হাসপাতাল রয়েছে। তার সম্মুখে রাস্তার অপর পাশেই এক বিরাট পুলিশ টেশন। পুলিশ টেশনে কাশ্মীরী পুলিশেরও একটি ক্যাম্প আছে। তাদের পাশেই ইভিয়ান সৈন্যরা এক শক্তিশালী শোট স্থাপন করেছে।

পোষ্টে দেড়শত ফৌজ থাকে।

এই পোষ্টে আক্রমণের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা দিনে সমগ্র এলাকা পরিদর্শন করে পজিশনের স্থান নির্বাচন করি।

পোষ্টের পঞ্চম পার্শ্বে ছুরাহ ইনিষ্টিউট। পোষ্টের মাত্র দুটি গেট। একটি ইনিষ্টিউটের গেটের সোজাসুজি মেইন রোডের অপরপাশে। অপরটি তার উভয় পার্শ্বে। একটি গেট কাশীরী পুলিশ ও অপরটি ইশ্বিয়ান আর্মিরা ব্যবহার করে।

পোষ্টের উভয়ের এলাহীবাগ মহস্তা ও অনাহার খিল। এখন থেকে উভয়ের দিকের সড়কটি সামনে গিয়ে দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। এর একটির নাম নওসাহারা রোড যা আলমগিরী হয়ে ডাউন টাউনের দিকে চলে গেছে। এই মোড়ের আলমগিরীতে ইশ্বিয়ান সৈন্যদের একটি পক্ষিশালী পোষ্ট রয়েছে। অপর শাখার নাম আলীজান রোড। যা গাড়ী মহস্তার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ছুরাহ ক্যাম্পের দক্ষিণ পার্শ্বে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এই ক্যাম্পের পূর্বে দিক বাদে বাকী তিনি দিক উচু দেয়াল দিয়ে দেরা। তিনি দিকের দেয়ালে কোন দরজা নেই।

প্রতি দিন নিয়মিত রাত সাড়ে দশটায় ডিসনাগ মন্দির থেকে একটা জীগ ও সাজোয়া গাড়ি খাবার নিয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। আমরা প্রথমে এই গাড়ি দুটির উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তার পর পরিস্থিতি বুঝে ক্যাম্পেও হামলা করা হবে।

আঠারোজন সাথীকে বাছাই করা হল। গাড়ি ডিসনাগ মন্দির থেকে বের হয়ে গানাই মহস্তার পাশের ছোট রাস্তায় উঠে মেইন রোডে আসে। আমরা ছোট রাস্তার মুখে মাইন স্থাপন করে সাথীদের পার্শ্ববর্তি মোর্চায় অপেক্ষা করতে বলি। রাস্তার এক পাশে মোর্চায় রাকেট লাঞ্চার ও অপর পার্শ্বে ক্লাসিনকভ ও এল এম জি নিয়ে সাথীরা

অপেক্ষা করতে থাকে।

যদি গাড়ি মাইনে ধ্বংস না হয় কিংবা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রাকেট লাঞ্চার থেকে তার উপর রাকেট নিষ্কেপ করা হবে। যদি কোন সৈন্য নেমে পালাবার চেষ্টা করে, তাকে ক্লাসিনকভের ব্রাশ মেঝে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে। আমরা মোর্চায় বসে শিকারের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। রাত বারোটায়ও গাড়ির কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা সাথীদের ডেকে জ্বলা করে মাইন তুলে সরাসরি পোষ্টের উপর হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ক্যাম্পে রাকেট দাগার জন্য সুবিধাজনক স্থান মাত্র দুটি। আমরা প্রথমে দক্ষিণ দিক থেকে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পাশদিয়ে হামলা করার চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্যা হল, যদি গোলা নিশানা প্রট হয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোন থামের সাথে আটকে যায় তবে সমগ্র শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ রচনায় এই অসুবিধা দেখা দেয়ায় আমরা ঘূড়ে মেইন রোডে এসে দেওয়াল থেকে মাত্র যাট মিটার দূরে দাঢ়িয়ে রাকেট নিষ্কেপ করার প্রস্তুতি নেই। ইতিপূর্বে ছুরাহ পোষ্ট মুজাহিদরা অনেক বার হামলা করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শতাধিক রাকেটও এর উপর বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হামলাগুলি হয়েছে অনেক দূর থেকে যার ফলে রাকেট হামলায় পোষ্টের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রাকেট নিষ্কেপ করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। বাকী সাথীরা তিনি ভাগে ভাগ হয়ে ক্লাসিনকভ ও এল এম জি নিয়ে একশত মিটার দূরে পজিশন নিয়ে বসে যায়।

সাবই মিলে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে অবশেষে একটি রাকেট পোষ্টের দিকে ছুড়ে দিলাম। ক্যাম্পের একটি জানালা দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছিল। এই কাম্রায় একজন অফিসার ঘূমাত। আমার রাকেটটি সোজা জানালায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড আওয়াজে রাকেটটি বিফেরিত হয়। সাথে

সাথে এই কাম্রা থেকে খুয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা গেল। রাকেটের ছোট ছোট টুকরা অন্যান্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়ায় আরও কয়েকটি কক্ষে আগুন লেগে যায়। যদিও রাকেটের সামান্য একটি গোলা মাত্র তিতেরে আঘাত হেলে ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাতে ক্যাম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাকেট ফায়ারের পর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চারিদিক ছিল নিরায় নিষ্ঠক। এর পর ওই দিকে আরও একটি রাকেট ছুড়ে দিলাম। এবারের রাকেটটি ছান্দে আঘাত হানে এবং ছান্দ উড়িয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় রাকেটটি বিফেরিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সাথীরা তাদের ক্লাসিনকভ ও এল এম জি দ্বারা অবিরামভাবে গুলি চালায়।

আমাদের ফায়ারের শব্দ শুনে ইনিষ্টিউট ও অন্যান্য পোষ্টের সৈন্যরা ফায়ার করতে থাকে। আমরা তাদের রেজের বাইর থাকায় আমাদের ক্ষেত্র হতাহত হয়নি। কিন্তু ছুরাহ পোষ্ট থেকে কেউ একটি গোলা ও নিষ্কেপ করল না। আমাদের আক্রমণের ফলে তারা ভীষণভাবে আতঙ্গিত হয়ে পড়ে। তারা পাঁচটা আক্রমণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। এর পর আমরা একটি মাইন মেইন রোডে স্থাপন করে পাশের মরিচায় অপেক্ষা করতে থাকি। ধারণা করেছিলাম, আক্রমণের পর ছুরাহ ক্যাম্পের দিকে চারিদিক থেকে গাড়ি আসতে থাকবে। কিন্তু আধা ঘটা অপেক্ষার পরও এদিকে কোন গাড়ি আসতে না দেখে মাইন তুলে নিয়ে যাই। এই হামলায় কতজন দুশ্মন হতাহত হয়েছে তা আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি।

কাশীরের নিয়ম হল কোন ফিল্পের হামলা করার পর তার বিবরণ নিজ নামে পত্রিকা অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেয়া। আমরা হামলার পর কোন পত্রিকা অফিসে খবর দেই নি। উপরন্তু আমরা এলাকা বাসীকে বলে এসেছি তারা যেন আমাদের (২৯ পৃঃ দেখুন)

মরণজয়ী হৃজন্ম

মল্লিক আহমাদ
সরওয়ার

একদিন আলী সবার সাথে ঘরে বসে নাস্তা করছিল। এমন সময় তারা জঙ্গী বিমানের শব্দ শুনতে পায়। খানা রেখে নিরাপদ মরিচায় পৌছার পূর্বেই তারা বোমা নিষ্কেপের আওয়াজ শুনতে পায়। সাথে সাথে বিকট শব্দে সেটি বিফোরিত হয়।

বোমাটি নিষ্কিপ্ত হয় তাদের ঘরের ওপরে। মুহূর্তের মধ্যে তাদের ঘরখানা ধ্বন্তুপে পরিণত হয়। তারমা ও ফুফু ঘরের মধ্যে ছিলো। তারা আত্মরক্ষার সুযোগ পেলেন না। উভয়ে বোমা বিফোরণে ক্ষত বিক্ষিত হয়ে তৎক্ষণাত দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যান। তার পিতাও মারাত্মকভাবে আহত হন। আলী সামান্য যথমী হয়। রক্ত ঝাড়া বাহ তুলে প্রতিশোধের শৃঙ্খল প্রজ্জলিত আলীর পিতা তাকে কাছে ডেকে বলে, বেটা! তুমি অনেক বার আমার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছ আমি তোমাকে অনুমতি দেইনি, এখন সময় হয়েছে আমি তোমাকে অনুমতি দিছি। তুমি খলীলকে সঙ্গে নিয়ে একুশি বেড়িয়ে পড়।

আলী তার পিতার যথম থেকে অব্যাহাবিকভাবে রক্ত ঝাড়তে দেখে মহত্বার সুরে বল্লো, “আরা! আপনি মারাত্মক আহত। আপনাকে এভাবে রেখে কিভাবে যাব?”

আলীর আরা বল্লেন, “আলী! তুম চিন্তা কর না। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তোমাদের সাথে মিলিত হব—ইনশাআল্লাহ। সময় খুব কম। বিমান হামলা করে তরা গ্রাম ধ্বন্ত করছে। এর পরই ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ী এসে গ্রাম ঘিরে ফেলবে। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উদের মুকাবিলা করব। যদি মরতেই হয় তবে লড়াইয়ের ময়দানেই মৃত্যুকে আলিংগন করব। কিন্তু তুম এখনও ছাট, তোমাদের ভবিষ্যত বহ বিস্তৃত। দেশের আবাদীর জন্য লড়তে হবে তোমাদেরই। তোমাদের বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। যদি দুশ্মন তোমাকে ধরে ফেলে তবে জিল্লা ছেড়ে দিবে বলে মনে করি না। অতএব তুমি আমার কথা শুন, একুশি এখান থেকে বেড়িয়ে পড়। আর প্রথম পথ ধরে হাটবে না। ইতিমধ্যে সেখানে দুশ্মনের ট্যাঙ্ক এসে গেছে। পিছনের পাহাড়ী পথ দিয়ে বেরবে। বারুদের খেলনা ও বারুদের মাইন দেখে পথ চলবে। খলীলকেও তোমার সাথে নিয়ে যাও। ভালভাবে উর দেখা শুনা করও। উর যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

বিদায়ের বেলা আলীর আরা তাকে একটি থলে হাতে দিয়ে বল্লেন, বেটা! এর মধ্যে কিছু টাকা আছে। যা আমি জিহাদে খরচ করার জন্য জমিয়েছি। তুমি এগুলি নিয়ে যাও। প্রয়োজনের সময় এর ধারা উপকার হবে। আলীর আববা আলীর কপালে ছয় দিয়ে অসীমত করে বল্লেন, সবকিছুর বিনিময়ে ইসলামের পতাকা সর্বদা সমৃদ্ধ রাখবে। তোমাদের গাফক্ষতির জন্য আল্লাহর নিকট যেন আমাকে লঙ্ঘিত হতে না হয়। আমি দুয়া করি যেন সকল আফগান নওজোয়ানের আফগানের ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বদা রক্ষার লড়াইয়ে শরীক হওয়ার ভাগ্য হয়। আমাদের জন্য ডেবনা। আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে শক্তির মুকাবিলা করব।” পিতার ক্ষত হান সে

রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয়। শহীদ মা ও ফুফুকে একবার দেখে চৌখে অঙ্ক ও হৃদয়ে প্রতিশোধের ঝুলিংগ নিয়ে সব মায়া পিছনে ফেলে বাড়ীর পিছন দিক থেকে পাহাড়ের দিকে নিদিষ্ট উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে কদম কদম অগ্রসর হয়। আড়ালে আবডালে শুকিয়ে শুকিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে। সেখানে একটি বোপের আড়ালে শুকিয়ে তারা গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে বিমানের আকর্ষিক আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন বিপদের আশংকা নেই। বোমা হামলায় সমগ্র গ্রাম ধ্বন্তুপে পরিণত হয়। অনেক নারী ও শিশু গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে হিয়রত করে চলে আসে। কিছু সময় পরে দুশ্মনের সাবোয়া বহর গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রামকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তারা গ্রামের উপর লাগাতার তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। তাদের চৌখের সামনে ঘটতে থাকে এই নারকীয় কাণ। ক্রমাগত গোলা বর্ষণের পর তাদের মনে হল যেন গ্রামের একটি প্রাণিও আর বেঁচে নেই। এই বর্ষণদের মুকাবিলা করার মত একটি প্রাণীও বুঝি বেঁচে নেই। এবার তারা ট্যাঙ্ক ও সাবোয়া যান থেকে নেমে ঝাসিনকৃত হাতে গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে। হঠাৎ তাদের সামনের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শুলি আসতে শুন হয়। কোন কিছু বুঝে উঠার আসেই দুশ্মনের কয়েক ডজন সৈন্য মাটিতে ঝুঁটিয়ে পড়ে। ঝুঁশ সৈন্যরা এবার সতর্ক হয়ে পিছনে এসে পুনরায় তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। এভাবে আরও এক ঘন্টা চলার পর ঝাসিনকৃত দ্বারা সামনের দিকে শুলি করতে করতে তারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে।

আলীর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। না হয় এখান থেকে অতি সহজে বেশ কিছু দুশ্মনকে হত্যা করা তার জন্য বেশ সহজ ছিলো। সে আফসোস করতে শাগলো, হায় যদি একটা অস্ত্র তার কাছে থাকতো। যখনই

দুশমনের লাশ মাটিতে ঝুটিয়ে পড়তে দেখতে সে আনন্দে তকবীর খনি দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের প্রতিরোধ ডেঙ্গে যায়। ফলে দুশমনের ট্যাঙ্ক ও সারোয়া গাড়ী ভিতরে ঢুকে পাইকারী তাবে সকল শ্রেণীর লোককে বন্দী করে। আলী করুণ চৌপে অসহয়ের মত সব দেখতে থাকে। খুশীরা গ্রামের পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের এক মাঠে জড়ে করে শ্রাবণ ফায়ারে সকলকে শহীদ করে। এরপর তারা পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসব দেখে আলীর হৃদয় ব্যাথায় কুকড়ে উঠে। খলীল এসব দেখে যানসিক মন্ত্রণায় আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী তাবতে থাকে, অবশ্যই তার আশা বেঁচে নেই। নিচ্ছয়ই শহীদদের কাতারে সামিল হয়েছেন তিনি। সে অঞ্চল সিঁড় নয়নে উঠে দাঢ়িয়ে খলীলকে নিয়ে পাহাড়ের অপর দিকে চলে যায়। তারা দু'জন দিন ভর হেটে সন্ধ্যায় পাহাড়ের এক গুহায় শয়ে পড়ে। উভয়ই ছিল ভীষণ ভীত। এত কম বয়সে এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনও তারা কর্মনাও করেনি। উপরস্থি অজানা পথের এই লহু সফর—তাবছে, কোথায় গিয়ে দাঢ়াবে। মঞ্জিলও দুশমনদের ঘাটি চেনে না, না জানে তাদের সহযোগীরা কোথায় আছে। সারা দিন পথ চলে ক্রান্ত হওয়ায় শোয়ার সাথে সাথে চোখে গভীর শূম নেমে আসে। শূমের ঘোরে সারা রাত আলী ভয়ঙ্কর আজে বাজে অপু দেখেছে। সকালে উঠে আবার হাটতে থাকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা মেপে মেপে দেখে শুনে চলতে থাকে। কোথাও মানুষের শব্দ পেলে পথ বদল করে নেয়। হতে পারে ওরা দুশমনদের লোক। অচেনা দেশে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

পথের পাশে একটি যায়গায় ঝর্ণা দেখতে পেয়ে তারা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। হাতের পুটলি থেকে রঞ্চি বের করে খেয়ে নেয় এবং প্রাণভরে পান করে স্বচ্ছ ঝর্ণার নির্মল পাণীয়। খলীল ক্রান্ত হয়ে পড়লে

আলী তাকে কাঁধে তুলে নেয়। দুশমনের কোন বিমানের আওয়াজ পেলেই ওরা বোপ বাড়ে কিংবা পাথরের আড়ালে শুকায় থাকে। এভাবে একাধারে তিন দিন সফর করার পর তারা ভীষণ ক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পায়ে ফৌসকা উঠে। চলার গতি ক্রমশ শুরু হয়ে আসে। সামান্য যে কয়তি রঞ্চি তারা এনেছিলো তাও শেষ হয়ে গেছে। খলীল ক্রুধায় কাতরাতে থাকে। বার বার আলীকে বলে “ভাইজান ভীষণ ক্রুদ্ধা পেয়েছে আর হাটতে পারছি না।” আলী তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, সামান্য চলনেই সামনে থাবার পাওয়া যাবে। আলীও ক্রমশ দুর্বলতা অনুভব করছে। ক্রুধায় পেট জ্বলতে থাকে। চলারশক্তি নেই তবুও সামনে অগ্রসর হতে হবে—চলতে হবে, তাই চলছে।

আব—হাওয়া খুবই উষ্ণ। হঠাৎ পঞ্চম আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ অন্ধকারে হেয়ে যায়। বিদ্যুতের চমক ও গর্জনে পাহাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠে। প্রচণ্ড বেগে বায়ু বইছে। এসব দেখে খলীল ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। আলী তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চেঁটা করে কিন্তু প্রচণ্ড বেগে বেয়ে আসা হাওয়ার মোকাবেলা করে মোটেই এগুতে পারছিল না। এমন সময় আকাশ ডেঙ্গে শীলা বৃষ্টি শুরু হয়। শীলা বৃষ্টি থেকে গা আড়াল করার মত কোন অঞ্চল না পেয়ে খলীলকে শীলা থেকে বীচাতে আলী নিজের চাদর তার মাথায় বেঁধে দেয়। শীলা গুলো আকার বেশ বড় হওয়ায় আলীর খালি মাথায় আঘাত লেগে প্রচণ্ড ব্যাথার সৃষ্টি করে। সামনে একটি ছোট বোপ দেখে তারা তার নিচে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ঝড় ও শীলা থেমে গেলেও বৃষ্টি থামার নাম নেই। প্রথমে প্রচণ্ড গরমে অস্ত্রির ছিল। এবার শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সন্ধ্যায় বৃষ্টি থেমে গেলেও পাহাড় থেকে বর্ষার পানি নালায় নেমে চল বইতে থাকে। পানির প্রোত্তরে সো সো আওয়াজ দূর থেকেও শুনা যায়। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়েও যাওয়া সম্ভব

নয়। খলীলের গা বেশ গরম হয়েছে। ক্রমেই জ্বরের তেজ বাড়তে থাকে। খলীল জ্বর ও ক্রুধার যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়তে থাকে। আলী খলীলের বেহাল অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে শান্তনা দিয়ে বঞ্চি, তুমি এখানে থাক আমি সাতার কেটে ওপারে যেয়ে দেখি খাওয়ার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা। তুমি বেশী অস্ত্রির হয়ো না। আশ্চর্ষ তার অসহায় বাস্তাদের জন্য কোন সুব্যবস্থা করবেনই। কিন্তু খলীল কোনক্রমেই একা থাকতে রাজী নয়। আলী নিরাশ হয়ে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকেঃ হে পরম করণাময় আস্তাহ! নাশার পানি শুকিয়ে দাও। যেন আমরা ওপারে যেতে পারি। আমাদেরকে বস্তুদের কাছে পৌছিয়ে দাও।” অসহায় মানুষের প্রার্থনা আস্তাত দ্রুত কবুল করেন।

এমন সময় আলী কারও পায়ে হাটার শব্দ শুনতে পায়। শক্র আশৎকায় প্রথমে তার শরীর শিউরে উঠে। খলীলের অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরিষ্কণেই সে সিন্ধান্ত নেয়, শক্র হোক মিত্র হোক এই লোকদের সাথে সে মিলিত হবেই। জীবন মরণের প্রশ্নে প্রয়োজনে শক্রও সাহায্য নিতে হয়। তাই এরা যদি শক্রও হয় নিজের উদ্দেশ্য গোপন রেখে সে তাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবে।

হাটার শব্দ অনুসরণ করে আলী শব্দ করে তাদেরকে ডাকতে থাকে। কারও ডাকার শব্দ শুনে সাতজন সশস্ত্র যুবক দাঢ়িয়ে যায়। আলী নিসৎকোচে তাদের নিকট তার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে। অবশেষে সে জানতে পারে, এরা সবাই মুজাহিদ। তারা নিকটবর্তী এক পোষ্টে হামলা করার জন্যে রওয়ানা হয়েছে। খলীলের অবস্থা দেখে কমাওয়ার ছয়জন সাথী নিয়ে হামলার জন্য চলে যায়। বাকী একজনকে এদের সাথে রেখে যায়। মুজাহিদদের কাছে হয়েছে খাওয়ার জন্য সামান্য শুড় ছিল। তা তারা খলীলকে থেকে দিল। শুড় থেরে খলীল সামান্য সুস্থিতা

অনুভব করে। নালার পানি কমলে মুজাহিদ যুবকটি তাদেরকে নিয়ে নালা পার হয়ে মুরকাজের দিকে চলতে থাকে। খলীলের পক্ষে হাটা সংব ছিল না বলে তাকে কৌধে করে নিতে হয়েছে। কয়েক ঘটা চলার পর তারা মুজাহিদদের একটি চোট মারকাজে পৌছে।

এই মারকাজ কায়েম করা হয়েছে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে। পূর্বে এতে জংলী জানোয়ার বাস করতো। মুজাহিদের তা সাফ করে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। মুজাহিদের তাদেরকে অবশিষ্ট কয়টি রুটি খেতে দেয় আর গরম চা তৈরি করে পান করায়। এক মুজাহিদের কাছে জুরের টেবেলট ছিল তা খলীলকে খাইয়ে দেয়া হয়। তারা শুয়েই গভীর নিস্তায় ডেংগে পড়ে। সকালে খলীলের জুর ছেড়ে যায়। মুজাহিদেরা নাস্তা করতে বসতেই রাতের আক্রমণকারী এক ফিরে আসে। কমাগুর প্রথমেই আলী ও খলীলের খবর নেয় এর পর গত রাতের অপারেশনের (আক্রিক হামলার) বিবরণ দেয়। দুশ্মনের বিশজ্ঞনেরও বেশী সৈন্য হতাহত হয়। কয়েকটি গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। বেশ কিছু রুশী অস্ত্র তাদের হাতে এসেছে। কমাগুর সেগুলি আলী ও খলীলকে দেখায়। এরপর অস্ত্রগুলি মারকাজের অস্ত্রাগারে জমা করা হয়। তিনি দিন পর্যন্ত আলী ও খলীল এ মারকাজে থাকে। এর পর কমাগুর তাদেরকে ওই প্রদেশের কেন্দ্রীয় মারকাজে পাঠিয়ে দেয়। মুজাহিদদের চীফ কমাগুর আলী ও খলীলের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি আলীকে বলেন, দেখ বেটা। আফগানিস্তানের সর্বত্র আজ জুলুম ও নির্যাতন চলছে। কোথাও বাইরের খেলনা, কোথাও বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে রুশীরা মুসলমানদের হত্যা করছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ নিচ্যই মুজাহিদদেরই বিজয়ী করবেন।

আলী বল্লো, দুশ্মনদের কাছে বিমান, ট্যাক্ষ এবং অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আছে। আলী

হাতে মুজাহিদেরা এর মোকাবেলা কিভাবে করবে? আলীর প্রশ্নের জওয়াবে কমাগুর বল্লেন, দুশ্মন যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন আল্লাহ তাদের থেকে বহুগ বেশী শক্তির মালিক। তুমি জরুর বদরের ইতিহাস দেখ। মুসলমানদের কাছে সামান্যই হাতিয়ার ছিল। আর তা নিয়ে তিনগুণ শক্তিশালী কাফেরদের ওপর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ আমরাও অতি শিখেই দেশকে রক্ষণদের থেকে আজাদ করব এবং আফগানিস্তানে ইসলামের বিজয় পতাকা উঠাব।

অল্প দিনের মধ্যেই আলী মুজাহিদদের পরিবেশের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেয়। এক দিন কমাগুরের কাছে যেমেন বলে, “আমাকে অস্ত্র দিন আমিও দুশ্মনের সাথে লড়াই করব।”

কমাগুর তাকে বল্লেন, “এখনও তুম ছোট, আমি তোমাকে ও খলীলকে পাকিস্তান পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। সেখানে লেখাপড়া শেষ করে ফিরে এসে তোমরা জিহাদে শরীক হবে। কিন্তু আলী নাহোড় বাল্লা। সে বলতে লাগলো, আমি এত ছোট নই যে বন্দুক উঠাতে পারবো না। আর এখন আমার অস্ত্র চালানোর শিক্ষা নেয়া বেশী প্রয়োজন। যা পাকিস্তানে নয় বরং এখানেই হাসিল করা সহজ ও সম্ভব। কমাগুর তাকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তে অনড়। অবশ্যে কমাগুর আলীর প্রস্তাব মেনে নেন। তবে শর্ত দিলেন, যহ মাস পরও কোন লড়াইয়ে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বরং টেনিসের সাথে সাথে সে মারকাজের সকলের খেদমত করবে। ঝর্ণা থেকে মুজাহিদদের জন্য পানি আনবে। জুনানী সংগ্রহ করবে এবং যখন যে কাজের প্রয়োজন তা করবে। এরপর তাকে অস্ত্র দেওয়া হবে এবং লড়াইয়ে যাওয়ার অনুমতি পাবে। আলী সানন্দে এ প্রস্তাব মেনে নেয়। খলীলকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়। যাওয়ার সময় খলীল খুব বেশী কামাকাটি করে। আলী

তাকে অনেক বুরায় প্রবৎ শাস্ত্র দিয়ে বলে, পাকিস্তান এসে সে মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করবে। হয় মাস পর আলীর টেনিং সমাপ্ত হলে চীফ কমাগুর তার হাতে অস্ত্র তুলে দেন। আলী অত্যন্ত খুশী হয়। সে এবার দুশ্মনের ওপর হামলা করার জন্য নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে।

আলী রাইফেল ও অন্যান্য ছোট অস্ত্র চালাতে সক্ষম হওয়ায় চীফ কমাগুর তাকে ছোট ছোট হামলায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। এসব অভিযানে আলী অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দেয় এবং প্রমাণ করে যে, সে অন্যান্য মুজাহিদদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। আলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে রকেট লাঠার ও বিমান বিহুৎসী তোপ পরিচালনা শিখে নেয়। এর পর সব ধরণের আক্রমণের সময় সবার আগে তাকেই ডাকা হয়। [চলবে]

কমাগুর আমজাদ বেলাল

(২৬পঃ পর)

সংগঠনের নাম প্রকাশ না করে। আমরা আমাদের তৎপরতার সত্ত্ব প্রচার চাই না। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কর্মদ্বারা সফল করে দেখাতে চাই। সংবাদিকরা আক্রমণকারীদের সন্তান করতে না পেরে নিজেরাই মহস্ত্রায় এসে খৌজ নিতে শুরু করে। পরদিন আসসফা, আফতার, শ্রীনগর টাইম্স ও চটান প্রত্তি পত্রিকায় হেড লাইনে আমাদের হামলার খবর প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার হেড লাইনে লিখিত হয় “হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী”-এর আক্রমণে ছুরাহ পুলিশ ট্রেশন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।” অন্য পত্রিকায় শিরোনাম করা হয় “হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী” ও সৈন্যদের মধ্যে শ্রীনগরে এক দীর্ঘ লড়াই” ইত্যাদি ইত্যাদি পরদিন ইঞ্জিন সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী মহস্ত্রায় হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন নির্মাই লোককে গ্রেফতার করে। মহস্ত্রার মধ্য থেকে হামলা না করে মেইন রোড থেকে আক্রমণ করায় তাদেরকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়। [চলবে]

(আল-ইরশাদের সৌজন্যে)

অনুবাদঃ মনজুর হাসান

ঈদ এসেছে ঈদ

কাজী হায়াত মাহমুদ

আজকে সবার ঘরে ঘরে,
ঈদ এসেছে ঈদ।
তোর না হতে তাইতো সবার,
তেজে গেছে নিদ।
ছোট বড় সবার মাঝেই
ঈদ এলো ভাই ঈদ।
তাইতো আজি খুশীর জোয়ার,
বইছে চারিদিক।
ঈদ এসেছে শহর-গাঁয়ে,
ঈদ এসেছে ঈদ।
সবার ঘরেই তৈরি আজ
খাবার বহু বিধ।
হিংসা ভোকার বাণী নিয়ে,
ঈদ এসেছে ভাই,
সবার সাথে মিলেই তো,
ঈদের মজা পাই।
ঈদের নামায পড়বে সবে,
ঈদগাহে এক সাথে।
সবার তরে খোদার রহম,
চাইবো মোনাজাতে।

ফী ছাবিলিল্লাহ

এমামুদ্দীন মোঃ তুহা

আমি মুজাহিদ ফী ছাবিলিল্লাহ,
সব কিছু দিয়েছি, দিব লিল্লাহ।
যায় যদি যাক, সব কিছু যাক,
ইসলামের মান উন্নত থাক।
শক্রতা, ভালোবাসা মোর ফিল্লাহ
সমান ইজ্জত কিছু চাই না,
লাঘুনা, দুঃখ, ব্যথা কিছু মানিনা।
ইসলামের রাজ দাও হে আল্লাহ।
নাম কাম চাই না, দল চাই না,
নেতা হতে চাইনা, মান চাইনা।
ইসলামী শাসন দাও হে আল্লাহ।
জান যদি নিতে হয় নিয়ে যাও।
মান যদি দিতে হয় দিব তাও,
মূল ধন দ্বিমান রাখ আল্লাহ।



দুখ মিয়ার স্বপ্ন

মোঃ মুহাম্মদ ইউসুফ

মাগো আমি কবি হব লেখব করিতা,
দেশের মানুষ গরীব কেন বলব খুলে তা,
তেদের কথা খুলে বলি তাই তো আমি কবি,
বেনিয়াদের কালো হাতে বন্দী হল রবি।

দুখ মিয়ার দৃঃখ সবই রাইল চাপা পড়ে,
বাংলা বাসীর ভাগ্যে সুখ বইবে কোন কালে?
অবশেষে তালা লাগাই দুখ মিয়ার মুখে
সুযোগ বুঝে কষছে ছুরি বাংলাবাসীর বুকে।

নইলে দেখ পূর্বে মোদের বর্ণের ইতিহাস,
সত্য কথা বলছি আমি ভাগ্যের পরিহাস।
বর্গীয় দেশ শেষ করিল বর্গীয় ঐ সেনা
নৌকা যোগে লুটে নিলো এই দেশের সব সোনা।

সেই অর্থে কায়িম হয় ইংলণ্ডেরী ব্যাংক,
ভারত বাসীর ভাগ্যে আসে জোর জুরুমের ট্যাঙ্ক।
দাসত্বেরী জিন্দেগীতো দাশালদেরী পেশা,
সে সময়ে ছিল অনেক ইং-বিলাতী যেসো।

শাসকেরা ছিলো সব তাদের অনুকূলে,
আমরা ছিলাম বিদ্রোহী ও তাদের প্রতিকূলে।
বিলাত-বীগার সুর ধারিল চেলা চামুভেরা,
আদর্শ প্রষ্ট ও নীতিহারা নিন্ত জাতির যারা।

খোদার কৃপায় অবশেষে বাধীন হল দেশ,
আশা ছিল ভালো হবে দেশের পরিবেশ।
কিন্তু কিছু রয়ে গেল লড় কুইডের ছেলে,
অদ্যাবধি ঘুরছে তারা কালো দুঃহাত মেলে।

আরও একবার স্বাধীন হলোম লক্ষ প্রাণ দিয়ে,
ভাগ্য চাকার উট্টো গতি ঘূরছে আরো জোরে।
দুখ মিয়ার স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশের বুকে,
ঐশী সুরে বাজবে বীগা সব মানুষের মুখে।

কিন্তু মোদের ভাগ্য আজো যেমন ছিল তেমন,
বিভোর কেন সুষ ঘুমে হতে হবে চেতন।
বেনিয়ারা ঘুরছে আজো দেশ ও দেশাস্তরে,
সাদা চামড়ার পিশাচ গুলোর নাই যে সরম মোটে।

বীর কেশবী বেরলভী ও তিতুর রাঁগা খুনে,
রংগীন সেই শাল পতাকা কোথায় শুকালে।
বালাকোটের রাজ্ঞি ঝাড়া রণ বাধ্য শুনে
শীষু কেন জোশ আসেনা মুসলমানের খুনে?

বসন্তের কোকিল গুলো বেদন সুরে গান করিবে,
দৃঃখ শুধু নাইত কেউ যিনি তাহার তান ধরিবে।
দুখ মায়ের দুখ মিয়ার সুখ হবে না কেন?
তাঁর বিলাপের ভেদ বুঝিতে কান দেবনা কেন?



- মোঃ তসলিমুল আলম,
- পোঃ ফকিরহাট,
- ভায়ঃ নাজিরহাট,
- চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ আমরা শুনে থাকি, আবার একদিন বিশ্বময় ইসলামী শাসন কায়িম হবে। যিনি এর নেতৃত্বে থাকবেন তাঁর নাম হবে ইমাম মাহদী (আলাইহির রেয়ওয়ান)। আমার জিজ্ঞাসা হলো ইমাম মাহদী কি কোন পিতা-মাতার সন্তান হবেন না আল্লাহ তাকে সরাসরি আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। যদি তিনি কোন পিতা-মাতার সন্তান হন তবে তাঁদের নাম কি হবে। ইমাম মাহদী কত বছর বয়সে দাজ্জালের মুকাবিলায় অবর্তীণ হবেন। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন, কোথায় ইমাম কাপে প্রকাশিত হবেন এবং কত বছর বয়সে তিনি ইস্তেকাল করবেন?

উত্তরঃ হী ইমাম মাহদী (আলাইহির রেয়ওয়ান) পিতা-মাতার সন্তান হবেন। স্বাভাবিক নিয়মে মায়ের উদ্র থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।

সহীহ হাদীসের আলোকে সকল আহলে হক এ কথার ওপর একমত যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নসলে তাঁর জন্ম হবে। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ের বংশ হবে সায়েদ। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ, পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম হবে আমেনা।

অনেক ক্ষেত্রে পুত্র যেরূপ পিতার চরিত্রে শুশোভিত হয় ইমাম মাহদী অনুরূপতাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যে শুশোভিত হবেন। তবে তিনি নবী হবেন না। তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে না।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, পবিত্র মদীনায় তাঁর জন্ম হবে এবং সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হবেন। মুকাবিলামায় তাঁর নিকট শোকেরা খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। কোন এক পর্যায়ে তিনি হিজরাত করে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাবেন।

অন্য একটি রেওয়ায়মতে বলা হয়েছে, যখন তাঁর হাতে মুসলিম-জনতা বাইয়াত গ্রহণ করবে তখন তাঁর বয়স হবে চাল্লিশ বছর। তাঁর খেলাফতের সম্মত বছর কানা দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তাঁর সাথে কাফির বাতিল শক্তির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাহদী তাঁর সৈন্য বাহিনীসহ দাজ্জালের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বেষ্টনির মধ্যে বন্দীহয়ে পড়বেন। এই মুহূর্তে ঠিক

ফজরের নামায়ের সময় দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য হযরত ইসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। ওই ওয়াকের ফজরের নামায তিনি মাহদী (আলাইহির রেয়ওয়ান)-এর ইমামতীতে আদায় করবেন। নামায শেষ করে তারা দাজ্জালের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হবেন। দাজ্জালও শক্ত পায়ে তাদের মুকাবিলা করতে উদ্যোগ হবে। পরিশেষে “বাবে সুদ” নামক স্থানে তাঁর তীক্ষ্ণ বর্ণার আঘাতে দাজ্জালের প্রাণ নাশ ঘটবে। এর পর থেকে তাদের হাতে ইয়াহদী ও নাসারাদের ঘৌঁটি ও কেন্দ্রগুলোর একটি একটি করে গতন ঘটতে থাকবে। তাদের নেতৃত্বে তখন আরেকবার বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ঘটবে। উন্মত্ত্বাশ বছর বয়সে ইমাম মাহদী ইস্তেকাল করবেন।

• আহমাদ নুরসুলাহ,
দরজায়ে ফখিলাত ফিল হাদীস,
জামেয়া হসাইনিয়া গহরপুর,
বালাগঞ্জ, সিলেট।

প্রশ্নঃ হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর শহীদ হযরত মাওলানা এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর বিভারিত জীবনী জানতেচাই।

উত্তরঃ আফগান জিহাদে বহিরাগত হিসাবে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শহীদ এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ছিলেন একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদই ছিলেন না। একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন বটে।

বর্বর রুশরা ১৯৭৯ইং আফগানিস্তানে হানা দিয়ে নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে যেরূপ হত্যা ও অমানবিক অভ্যাচরসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল তা দেখে এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর ইমার্ন দীপ্ত কোমল হৃদয় দার্শনতাবে আহত হয়। তিনি ভীরুদ্দের মত করুণার চোখে তাকিয়ে সামান্য দুঃখ প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে না ডেবে হানাদার রুশদের মুকাবিলায় অন্ত হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮০ থেকে তিনি আফগান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করতে থাকেন।

এই তৎপরতাকে আরও ব্যাপক ও সুসংহত করার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর জন্ম হয়। আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মুজাহিদদের এটি একটা মিহ্বুত প্লাট ফরম। শহীদ আদুল রহমান ফার্মকী (রাহঃ) ছিলেন এই সংগঠনেরই চীফ কমাণ্ডার।

এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ১৯৫১ সনের ৫ই জুন পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নেন স্থানীয় স্কুল এর জামেয়া কামেয়মিয়া ফয়সালাবাদে দু' বছর। দারুল উলুম পিপলস কলেজী ফয়সালাবাদে কিছুদিন এবং কুমিয়া শরীফ হযরত মাওলানা কান মুহাম্মদ সাহেবের মাদ্রাসায় দু' বছর পড়াশুনা করেন। জামেয়া রশিদিয়া সাহিত্যাল-এ বিভিন্ন গুরন্তপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহনের সিদ্ধান্তে আরও দুবছর কাটান। অতপর পাকিস্তানে বিখ্যাত কওয়া প্রতিষ্ঠান জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া আল্লামা বিননুরী

টাউন করাচীতে ১৯৭৯ সনে দাওরা হাদীস শ্রেণীতে তৰ্তি হন। এই শিক্ষা বছৱেই তিনি ১৯৮০-এ ১৮ই ফেব্রুয়ারী আফগান জিহাদে চলে যান। পৱনবৰ্তী বছৱ জামেয়া রশিদিয়া সাহওয়াল থেকে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার ছৃঢ়ান্ত পৰ্ব দাওরা হাদীছে পৱীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উন্নীৰ্ণ হন।

আফগানিস্তানের বহু অপারেশনে তিনি অংশ গ্ৰহণ কৱেছেন। একাধিক জিহাদে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে তাঁৰ শেষ সফৱতি ছিলো ১৪০৫ ইজৰীৰ ৬ই শাওয়াল।

আমীৰ এৱশাদ আহমাদ (ৱাহঃ) সহ ৪৫ জন মুজাহিদ বিশিষ্ট এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ঈদ মুহাম্মদ। একটি ট্ৰাকটৰ ট্ৰলিতে কৱে প্ৰয়োজনীয় রসদসহ তাৱা পাকতিয়া ও গজনিৰ মধ্যদিয়ে পৰ্যানার পথে রওয়ালা হন। পথে মাগৱীৰেৰ নামায আদায় কৱে আবাৰ পথ চলো শুনু হয়। কিন্তু শক্র বাহিনীৰ সতৰ্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিদৃষ্ট স্থানে পৌছা খুব কঠিন বিধায় তাৱা রাত দশটা পৰ্যন্ত একস্থানে অবস্থান নেয়। পথে কোন অনুবিধা থাকলে তা তৎক্ষণাৎ অবহিত কৱাৰ জন্য স্থানে পূৰ্ব থেকে সোক নিয়োজিত কৱা হয়। কিন্তু তাদেৱ পৌছতে দেৱী হওয়ায় পাহাৰা তুলে স্বাই চলে যায়।

শক্র বাহিনীৰ গুণ্ঠৰ তাদেৱ সংবাদ জেনে তা বৰ্ণবাহিনীকে অবহিত কৱলে তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ বাহিনীৰ ওপৰ সাড়োশি আক্ৰমণ কৱাৰ জন্য তাৱা সকল প্ৰতৃতি সম্পৰ্ক কৱে রাখে। মুজাহিদ কাফেলা নিদৃষ্ট স্থানে পৌছে দেখে, তাদেৱ একজন পাহাৰাদাৰও নেই। তাদেৱ পৌছতে দেৱী হওয়ায় তাৱা সকলে চলে গেছে। এই সুযোগে শক্রবাহিনী তাদেৱ অবস্থান স্থলেৰ বিশ মিটাৰ দূৰে এসে অবস্থান নেয়। শক্র যে এত কাছে মুজাহিদৰা তা অনুমান কৱতে পাৱেনি। আনুমানিক রাত সাড়ে দশটাৰ সময় মুজাহিদেৱ গাড়ীৰ ওপৰ শক্রেৰ একটি মোৰা এসে বিছোৱিত হয়। যাৱ ফলে গাৱীৰ ইঞ্জিনে আগুন ধৰে যায়। এৱ পৰই শুনু হয় শক্রপক্ষেৰ বৃষ্টিৰ মত গোলা নিক্ষেপেৰ পালা। আভাৱে পনেৱে মিনিট চলে। এই সময়েৰ মধ্যে গুলি বোমা ও গ্ৰেনেট এত পৱিমাণে নিক্ষেপ কৱা হয়েছে যে, একজন মুজাহিদও বেঁচে থাকাৰ কথা নয়। উপৰন্ত গাড়ীতে থাকাও সতৰ্ক নয়। সমস্ত গাড়ীতে আগুন ছলছে। এই আলো চিহ্নিত কৱে ওৱা ওদেৱ আক্ৰমেৰ ধাৰা আৱও তীব্ৰ কৱে।

তবে মুজাহিদৰা দমিত না হয়ে শক্রৰ মুকাবিলা কৱাৰ জন্য পঞ্জিশন নেয় এবং শক্রৰ ওপৰ গুলি কৱতে থাকে। এক পৰ্যায়ে শক্রৰ একটি গুলি আমীৰ এৱশাদ আহমাদ (ৱাহঃ)-এৰ ঠিকবুকেৰ মাৰখানে এসেবিদ্ধ হয়ে ওপাশ দিয়ে বেৱিয়ে যায়। এই অবস্থায়ও তিনি সাথীদেৱ দৃঢ়ভাৱে মুকাবিলা কৱাৰ জন্য উৎসাহিত কৱছিলেন। তিনিও তাৱ বন্দুক দিয়ে ওদেৱ প্ৰতি গুৱি ছুড়ছিলেন। বাৱ বাৱ তাকবীৰ ধীৰী তুলে মুজাহিদেৱ মনে শক্রি সঞ্চয় কৱছিলেন। এদিকে তাৱ শৱীৰ থেকে রক্ত বাৱে জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। জিহাদেৱ ময়দানে তিনি চীৱ নিদ্রায় চলে পড়েন।

শহীদ (ৱাহঃ) প্ৰায়ই বলতেন, আমি যদি জিহাদেৱ ময়দানে

শহীদ হই তাহলে আমাৰ দাশ বাড়ী নিয়ে আসবে না। বৰং সঙ্গৰ হলে ময়দানে আৱও সামনে অগ্ৰসৱ হয়ে আমাৰে দাফন কৱবে। তাৱ এই অসিয়ত ও ওই এলাকাৰ লোকদেৱ অনুৱোধে পাকতিয়াৰ শাৱানা শহৱেৱ নিকটে 'কোট ওয়াল' স্থানে তাুকে দাফন কৱা হয়। এই জিহাদে বাংলাদেশী মুজাহিদ হাফেজ কামৱজ্জামানও শাহাদাত বৱণ কৱেন। এঁদেৱ সকলকে একই স্থানে দাফনকৱা হয়েছে। এলাকাৰ লোকেৱা শহীদদেৱ এই কৱৰস্থানকে 'বাগে জান্মাত' বলে অবিহিত কৱে। তাদেৱ শাহাদাতেৱ তাৱিখ হলো ২৫ জুন ১৯৮৫ সাল।

এই জিহাদে বাইশ জন মুজাহিদ শাহাদাত বৱণ কৱেন। আৱ শক্র সৈন্য নিহত হয় পঁয়ত্ৰিশ জন।

- মোঃ আব্দুল আজিজ ভুঁঞ্চা,
দাদশ শ্ৰেণী,
জামিয়া হসাইনিয়া গওহৱপুৰ,
সিলেট।

প্ৰশ্নঃ কুপসী জহুৱাৰ কাহিনী ও পৰিত্ৰ কুৱানে উল্লেখিত হাৰলত-মাৰত সম্পৰ্কিত ঘটনাটি জানাবেন কি?

উত্তৰঃ ইয়াহুদী জাতি তাদেৱ দীন ও কিতাব ছেড়ে এক পৰ্যায়ে জাদুবিদ্যাৰ ভক্ত হয়ে পড়ে। তাদেৱ মধ্যে অৱাভাৱিক রকম জাদু চৰ্চাৰ ব্যাপকতা দেখা দেয়।

দৃষ্টি পক্ষ থেকে তাৱা জাদু শিক্ষা কৱে। এক, হয়ৱত মুগায়মান (আঃ)-এৱ সময় ছিল ও মানুষ একই সমাজে বাস কৱত। এই সূত্ৰে খারাপ প্ৰবৃত্তিৰ ছিল-শয়তান মানুষকে এই বলে জাদু শিখাত যে, তাৱা সুলায়মান (আঃ) থেকে এই বিদ্যা শিখেছে এবং তিনি জাদু বলেই ক্ষমতায় টিকে আছে।

ছিল শয়তানদেৱ এই মিথ্যা ভাষণেৰ প্ৰতিবাদ স্বৱপ পৰিত্ৰ কুৱান বলা হয়েছেঃ “এই সব কুফুৰী, সুলায়মানেৰ নয়।” এৱ দ্বাৱা বুঝা যায় যে, সুলায়মান (আঃ) যে জাদু বলে শাসন কৱেছেন শয়তানেৰ সে কথা সম্পূৰ্ণ মিথ্যা এবং অপঠচাৰ বই নয়।

দুই, হাৰলত মাৰতেৱ মাধ্যমেঃ বাবল শহৱে এই ফেৱেশতাদ্বয় মানুষেৰ সুৱতে বাস কৱতেন। তাৱা জাদু বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে কেউ তাদেৱ নিকট জাদু শিখতে আসলে স্পষ্টভাৱে তাদেৱকে বলতেন, ‘জাদু শিখলে ঈমান থাকে না।’ তাৱপত্ৰ কেউ পিড়া পিড়ি কৱলে অগত্যা তাৱা জাদু শিখাতে বাধ্য হতেন।

এই ফেৱেশতাদ্বয়কে আল্লাহ তা’আলা মানুষেৰ পৱীক্ষাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰেৱণ কৱেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, এদেৱ সাথে কুপসী জহুৱাৰ নামক এক মহিলাকে সম্পৰ্কিত কৱে যে কাহিনী প্ৰসিদ্ধ হয়ে আছে তাৱ সত্যতাৰ পক্ষে কোন প্ৰমাণ নেই।

নিষ্পাপ ফেৱেশতাদেৱ সম্পৰ্কে এইৱপ কোন কথা ও মিথ্যা অপবাদ প্ৰদান চৰম অন্যায় বই কি? এ সব ঘটনা ইয়াহুদী ও মুনাফিক সাৰা গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি। এসব ঘটনা বৰ্ণনাৰ ব্যাপৱেৱ সকলেৱ

সতর্কতা কামনা করি। যারা এ পর্যন্ত বিভিন্ন বই পুস্তকে ও ওয়াজ নসীহতে হারাত মারাতের ঘটনার সাতে কথিত জহুরা বিবির ঘটনা রসাল ভর্গিতে লিখেছেন বা বলেছেন তাদের সে প্রচেষ্টারও প্রতিবাদ জানাই।

• মুহাঃ মিমি,
দশম শ্রেণী,
শাহবাজপুর ঝুল, যশোর।

প্রশ্নঃ যদি কোন মহিলা কোর্ট তালাক করে প্রথম স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই ঘরে যদি সন্তান হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সন্তানের হকুম কি?

উত্তরঃ মহিলার কোর্ট তালাক যদি শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে তার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে বাঁধা কোথায় এবং দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে যদি সন্তান হয় তবে এই সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কই?

আপনার প্রশ্নে এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, মহিলা তার প্রথম স্বামীকে কোন কারণে কোর্ট তালাক দিয়েছে। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্ত প্রকাশে অপারগ থাকায় দুঃখিত। প্রশ্ন পরিকার করে লিখলে আগামীতে সিদ্ধান্ত মূলক উত্তর দিতে চেষ্টা করব। কেননা কোর্ট তালাক যে সর্বক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য এমন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদেরকেও স্বামীর থেকে বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার শরীয়তে দেয়া হয়েছে।

মিজানুররহমান,
গামাঃ মাঝুয়া খালী, পোঃ নাগের পাড়া,
জেলাঃ শরীয়তপুর।

প্রশ্নঃ (ক) পুরুষের জন্য হাতে ও হাতের আঁগলে মেহনী ব্যবহার করা জায়ি আছে কি?

(খ) মেয়েদের সতর মেয়েদের সামনে ও মুহরিম পুরুষের সামনে কতটুকু জানতে চাই।

উত্তরঃ (ক) ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায় এইরূপ কোন প্রকারের প্রসাধনী ব্যবহার পুরুষের জন্য জায়ি নয়। মেহনী এর আওতায় পড়ায় এ ব্যাপারেও ওই একই হকুম বর্তায়।

(খ) মেয়ে লোকের বেলায় মেয়েলোকের সতর ততটুকু এক পুরুষের বেলায় অন্য পুরুষের যতটুকু। অর্থাৎ নাতি থেকে হাটু পর্যন্ত।

মুহরিম পুরুষের সামনে চেহারা, মাথা, সিনা, হাতের কঙ্গি ও পায়ের নলসহ নিন্যাংশ সতরের অস্তর্ভূত নয়। তাদের সামনে শরীরের এই সব স্থান খোলা রাখা যায়।

• সিকদার আবুল বাশার,
প্রয়ত্নেঃ আঃ মালেক সিকদার,
থানা শিক্ষা অফিস,
তেরখানা, খুলনা।

প্রশ্নঃ জনৈক লোক দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্রোগে ভুগছে। বহু চিকিৎসার

পরও সুস্থ হচ্ছে না। এখন দৈর্ঘ্য হারা হয়ে বলছে যে, সে আর আল্লাহর ইবাদাত করবে না এবং সে এখন কোন ইবাদাত করেও না। এ লোকটির ব্যাপারে সুপরামর্শ চাই।

উত্তরঃ ওই লোকটির কথায় মনে হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ইবাদাতের মোহতাজ। আল্লাহ কেন তার রোগ আরোগ্য করছেন না এটাই তার অভিযোগ এবং নামায রোগ পালন না করার কারণ। আসলে এসব স্পষ্ট শয়তানের ওয়াস ওয়াস। লোকটির এখনই তওবা করা উচিত। এই অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে পরিণতি কত ভয়াবহ হবে তা তার ভেবেদেখা উচিত। যে লোকটি রোগের সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর ওপর গোবা হয়ে নামায রোগ চেড়ে দিয়েছে সে ব্যক্তির তাবা উচিত, নামায রোগ পালন নাকরার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির সময় সে কার ওপর কোন কারণে গোৱা হবে? সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই বৃক্ষিমানের কাজ। আর তারাই প্রকৃত বৃক্ষিমান যারা আল্লাহর সব হকুম আহকাম পুঁথানপুঁথ পালন করে ও পরকালের ভয়ে কাতর থাকে এবং আল্লাহর ফয়সালা স্বতুষ্টিতে গ্রহণ করে নেয়। তাই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মর্মার্থে বলা হয়েছে, “আল্লাহই তাকেই হেদায়াত দেন তিনি যার কল্যাণ চান।”

মোহাম্মদ ইয়াসিন,
জামেয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ ওহাবী ও সুন্নী কাদেরকে বলে এবং আমাদের দেশে কোন ওহাবী আছে কি?

উত্তরঃ ওহাবীকে সুন্নী থেকে আলাদা কোন মতবাদ বলে মনে করার কারণ নেই। যাদেরকে ওহাবী বলা হয় তারা আসলেই সুন্নী। মূলত ওহাবী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া একটা অধীন অপবাদ। অষ্টাদশ শতকে আরবে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ওয়াহহাব নজদী নামক একজন সংস্কারকের আবির্ত্ব হয়। গোর-পূজাসহ নানা প্রকার গোমরাহি ও বেদায়াতের মধ্যে পতিত মুসলমানদের প্রকৃত হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন।

কিন্তু তিনি ইংরেজদের ঘোর শক্তি থাকার কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা তার বিঘ্নক্ষেত্রে কুৎসা রাটাতে থাকে। আমাদের তারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ আহমাদ শহীদ কর্তৃক পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনকেও ইংরেজরা ওই একই কারণে ওহাবী নামে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ওরা এক শ্রেণীর ধামাখরা আলিম ও শীর পর্যন্ত নিয়মান্তরিত করেছিলো। ইংরেজরা বহু আগে এদেশ থেকে চলে গেছে। সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও আবুল ওহাব নজদীর আন্দোলনের যথার্থতা আজকের শক্তিত মুসলমানরা উপলক্ষ্য করতে পরছেন, কিন্তু একশ্রেণীর লোক কোন কিছু না বুঝে চিন্তা না করে স্বাধীনচেতা, সংস্কারবাদী, ইকানী আলিমগণকে এখনও ওহাবী নামে অভিহিত করছে। যা দুঃখজনক বই কি?

ওহাবী যেহেতু আসাদা কোন মতবাদ নয় তাই কেউ নিজেকে ওহাবী বলে দাবী করে না। তাই এদেশেও কোন ওহাবী নেই।

আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় যারা বিশ্বাসী তারাই সুন্নী। এদেশের এক প্রকার বেদায়াতী আছে যারা নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করে। আসলে তারা হয়ত ততু না হয় চরম গোমরাহীর মধ্যে নিপত্তি।

• মোঃ নূরুল্ল ইসলাম,
শাস্তিনগর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ কুরআন শরীফ সর্ব প্রথম কোন দেশে কত সনে কার উদ্যোগে ছাপা হয়। কিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তরঃ মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। শুধুমাত্র কুরআন লেখার লক্ষ্যে মুসলমানরা আরবী ক্যালিগ্রাফী বা লিপি সৌর্কর্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর জার্মানীর হামবুর্গ শহরে জার্মানীদের দ্বারা ১০১১ সনে সর্ব প্রথম কুরআন শরীফ মুদ্রিত হয় বলে জানা যায়। মুদ্রিত সেই কুরআন শরীফের একখানা কপি মিসরের দারুল কুতুবে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। মুসলমানগণ কর্তৃক সর্ব প্রথম রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রঃ মাওলায়ে ওসমান নামক এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুদ্রণ করেন। একই সনে তেহরান থেকেও লিখু মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কুরআন শরীফের আরও একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

আব্দুল মাবুদ,
শাহজাদপুর, বাড়া,
গুলশান, ঢাকা।

প্রশ্নঃ ফরজ পর্দা পালন করলে নারী জাতিকে পক্ষ হয়ে থাকতে হবে এবং নর ও নারীর সমান অধিকার থাকবে না। এরূপ মন্তব্যের জবাব কি?

উত্তরঃ পর্দা ফরয হওয়ার পর থেকে চৌদশ বছর অতীত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনোনির্দার মুসলিম নারী পর্দা পালন করে আঙ্কিক দিক দিয়ে পক্ষ হয়ে গেছে এমন কথা এখনও কেউ বলতে পারেন। সামাজিক দিক দিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা বিদার ক্ষেত্রে পক্ষু প্রাণ হয়েছেন এমন খবরও আমরা পাইনি। তারা পুরুষের সমান অধিকার পাননি এমন ঘটনাও ইসলামী সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং দেখা গেছে, 'হেজাব' বা পর্দার বিধান দিয়ে ইসলাম নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদার আসন দান করেছে। পুরুষের অধীন করে পিঞ্জিরায় আবক্ষ করেনি। পর্দাহীনা অবস্থায় নারীরা পদে পদে যে লাঙ্গলার শিকার হতেন এবং এখনো হচ্ছেন, তা থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলিম নারীরা মর্যাদা ও অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। লঙ্ঘন নিবারণ ও শীত শ্রীমতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সভ্য দুনিয়ার মানবেরা পোশাক পরিধান করে। এখন যদি গভীর জঙ্গল থেকে কোন একদল উলঙ্গ মানুষ সোকালয়ে এসে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা শুরু করে যে, মানুষ যেহেতু পোশাক পরিচ্ছদহীন অবস্থায়

ভূমিষ্ঠ হয় তাই পোশাকের বেড়াজালে মানব দেহ আবৃত করা মানুষের স্বত্ত্বাবগত শাক্ত্যন্ত্য ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা শোশাকের বাধ্যবাধকতা ত্যাগ করে উলঙ্গ হতে পারে তারাই প্রকৃত স্বাধীন। তবে তাদের বক্তব্যকে কি যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে? তেমনি ইসলামের পর্দা অর্থ নারী জাতিকে অবরুদ্ধ করা নয়; বরং পর পুরুষের স্বত্ত্বাবজ্ঞাত লুক দৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেদের আকর্ষণীয়তাকে আড়াল করে রাখতে যত্বান হওয়া। সুতরাং লুক্স জামা ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া যদি পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা বলে বিবেচিত না হয়। তবে পর্দা রক্ষা করার মতো পোশাক পরে বেড় হওয়া নারী জাতির জন্য অবরোধ বলে বিবেচিত হওয়াও বিবেকের দাবী নয়।

• মুহাম্মাদ ইলিয়াস,
কাউখালী, পিরোজপুর।

প্রশ্নঃ হয়তের আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশতের মধ্যে যে নিষিদ্ধ গাছটির ফল খেয়েছিলেন ওই গাছটির নাম কি? কোন কোন বই কিতাবে ওই গাছটির নাম 'অমর বৃক্ষ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে কি তাই?

উত্তরঃ ওই গাছটির নামকি তা কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচনা করেছিলো যে, এই গাছটি 'অমর বৃক্ষ'। এর ফল ভক্ষণ করলে আপনারা চিরঝীব হবেন এবং অনন্তকালের জন্য বেহেশতে থাকার অধিকার লাভ করবেন। এক পর্যায়ে তারা শয়তানের প্ররোচনায় প্রসূক হয়ে আল্লাহর আদেশ ভুলে ওই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই সময় আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)কে বেহেশত থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

গতসংখ্যায় এইরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিলো যে, "সেই গাছটির নাম ছিলো অমর বৃক্ষ।" এ অংশ এভাবে পড়তে হবে যে, শয়তান তাদেরকে এই গাছটির নাম অমর বৃক্ষ বলে প্রসূক করেছিলো।

আপনার কপিটি নিয়মিত এই ঠিকানা থেকে খুঁজে নিন
সিলেট শহরের সকল "জাগো মুজাহিদ"
পাঠক ও গ্রাহকগণ সরাসরি এই ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন

এজেন্টঃ মাসিক জাগো মুজাহিদ

সৈয়দ কাওসার আলী
পুস্তিকা পেপার এণ্ড কনফেকশনারী,
৭ নং সফর মার্কেট, চাঁদনী ঘাট,
সিলেট।

নবীন মুজাহিদদের পাতা



পরিচালকের চিঠি

আস্সালামু আলাইকুম

গ্রিয় নবীন বন্দুরা!

অশা করি তোমরা সবাই তালো আছো। তবে আমার মনে হয় তোমরা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছ। তোমরা পূর্বের তুলনায় অনেকটা অমনোযোগী বলে মনে হয়। না হয় গত সংখ্যায় কারও উন্নত সঠিক না হওয়ার কারণ কি? প্রশংসন্দোকি খুব কঠিন ছিলো? ধারণা ছিলো একটু চেষ্টা করলে তোমরা এর সঠিক উন্নত খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু প্রারন্তি বলো, এ লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে?

তোমাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা। তাই তোমাদেরকে পড়াশুনায় আরও আগ্রহী হতে হবে। প্রত্যেক সদস্য প্রতি সংখ্যার প্রশ্নের উন্নত পাঠাবে। নতুন তোমাদের সদস্য হওয়ার স্বার্থকতা কোথায়? যদি তোমাদের ফেব্রু নাম ঠিকানা ছাপানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করব-এর মধ্যে যারা উন্নত পাঠাতে অসম্ভত করবে তাদের ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করব। আশা করি তোমরা আমাদেরকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে না। এ ব্যাপারে আগামী সংখ্যায় আবার দ্বিতীয়। তোমাদের লেখা-পড়ায় ভঙ্গো করা ও সুবী জীবন কামনায়

পরিচালক ভাইয়া

গত সংখ্যার উন্নত কারও সঠিক না হওয়ায় পূর্বের প্রশ্ন রেখে দেয়া হলো।

বলতে পারো?

- ১। বাংলা সনের উত্তোলক কে?
- ২। জাহিসিয়াত যুগে আরবের লোকেরা পবিত্র কা'বাকে ঘিরে বর্ষণুর যে বর্ণাচ্য মেলা অনুষ্ঠান করতো সেই মেলাটি কি নামে প্রসিদ্ধ?
- ৩। আল হামরা প্রসাদ কোন শহরে অবস্থিত?
- ৪। শেখ সাদী কত সনে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৫। কাদেরকে আশরায়ে মুবাশশারা বলা হয়, তাদের নাম কি?

নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম	বয়স
পিতা	শ্রেণী
পূর্ণ ঠিকানা	

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অংগীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংগ্রহ করব।

স্বাক্ষর

এই কুপনটি কেটে পূরণ করে দুই টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট সহ আমাদের ঠিকানায় পাঠালে আমরা তাকে নবীন মুজাহিদদের সদস্য করে নিবে।

তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

১৪৩। কাজী আবদুল্লাহ আল-মামুন,
পিতাঃ কাজী আবুল ফোঁ মোঃ নূরে ছাকা,
জার্মানী হোষ্টেল, রুম নং-২২,
পি.ডি.বি. কলোনী, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ
কেন্দ্র, আশুগঞ্জ বি.বি.বাড়িয়া।

১৪৪। মোঃ জামাল উদ্দিন,
পিতাঃ মাওঃ মোঃ আবু ইউসুফ,
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল
উলুম জামিল মাদ্রাসা,
বগুড়া।

১৪৫। মোঃ আমিনুর রহমান,
পিতাঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা,
গ্রামঃ দক্ষিণ চাঁদপুর,
পোঃ সীমাখালী, বাঘারপাড়া,
ঘোর।

১৪৬। মুহিবুর রহমান খান (তাকরীম)
পিতাঃ মাওঃ আতাউর রহমান খান
নূর মঙ্গিল,
জামিয়া তৰন,
কিশোরগঞ্জ।

১৪৭। মোঃ এনামুল হক (নাহির),
পিতাঃ ডি. এম. আবু নাহির
মুহাঃ আনোয়ারুল হক,
গ্রামঃ লোহারম্পুর,
সিলেট।

১৪৮। হাফেজ হাফিজুর রহমান,
পিতাঃ মোঃ মুনত্তুর রহমান প্রমাণিক,
গ্রামঃ যশীগুর, (বালুপাড়া),
পোঃ বাগবাড়ী,
বগুড়া।

১৪৯। মোঃ জামাল উদ্দীন (মাসুম),
পিতাঃ বজ্জুর রহমান,
সাংঃ সাহায্যা,
পোঃ হরিপুর, বাজার,
ছাগল নাইয়া, ফেনী।

১৫০। মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম (শারীম),
পিতাঃ ডঃ আব্দুল আউয়াল,
মেসার্স জনতা হেমিও ফার্মেসী,
পোঃ তোরা জগৎপুর, হরিশ্চর
চৌরাটা, সাকসাম, কুমিল্লা।

১৫১। মোঃ তারেক মাহমুদ,
পিতাঃ কুরী মোহাম্মাদ হোসাইন,
গ্রামঃ আশুগঞ্জ পূর্ববাড়ী,
পোঃ কাজুলিয়া, কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫২। মোসাঃ বুশরা মাহমুদ নাবিলা,
পিতাঃ মুফতী মোঃ আঃ আহাদ,
গ্রামঃ আশুগঞ্জ, পোঃ কাজুলিয়া,
কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৩। মোঃ সেলিম,
পিতাঃ মোঃ নীল মিয়া,
গ্রাম খোশকালি,
পোঃ দাড়িয়ার চৰ বাজার,
বানছারামপুর, বি-বাড়িয়া।

১৫৪। কাজী মোঃ আবু তাহের,
পিতাঃ কাজী মোঃ মারান (মাছুম),
গ্রাম ও পোঃ মাৰবাড়ী,
কোটালী পাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৫। মোঃ মুফিজুর রহমান (কুমী),
পিতাঃ মাট্টার মোঃ লিয়াকত আলী খান,
গ্রামঃ রংকুরা (খা বাড়ী),
পোঃ মাৰবাড়ী, কোটালী পাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৬। মোঃ মোন্তফা কামাল (রংবেল),
পিতাঃ আবু খালেদ খান,
জামাল মঙ্গিল,
কুয়ার পাড়া,
সিলেট।

১৫৭। হাফেজ মুহাম্মাদ রিজওয়ানুল বারী,
মুহাম্মাদ ফজলুল করিম,
গ্রামঃ মুহাপুর,
পোঃ পশ্চিতের হাট,
সন্দীপ, চট্টগ্রাম।

১৫৮। হাৎ আশিকুর রহমান (মিঠু),
পিতা এম. এ, আমিনুদ্দীন,
গওহর ডাঙা মাদ্রাসা,
চুক্ষিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৯। মোঃ মিজানুর রহমান জাফরী,
পিতাঃ মাওঃ আঃ শুয়াছেল,
গ্রামঃ পাতাছড়া, পোঃ কলাবাড়ী,
উপজেলা: রামগড়,
জেলাঃ খাগড়াছড়ী।

১৬০। মোঃ আকরামুজ্জামান,
পিতাঃ মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়া,
গোয়াল চামট আশরাফুল উলুম
মাদ্রাসা,
পোঃ শ্রী অংগন, ফরিদপুর।

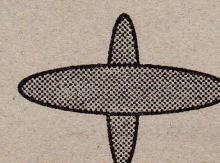
১৬১। হাফেজ মুহাঃ আব্দুল জলিল,
পিতাঃ আবু তালেব বিশ্বাস,
সাং বড় ঘিঘাট,
পোঃ বিনিপন্গর, থানাঃ কালিগঞ্জ,
ঝিনাইদহ।

১৬২। মোঃ হমায়ুন কবির (শাহজাহান),
পিতাঃ মোঃ নজিম উদ্দীন,
গ্রামঃ হেনেনচা,
ডাকঘর, তাদুরিয়া,
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১৬৩। এইচ. এম. এ, বাশার,
পিতাঃ মোঃ আঃ করিম মোল্লা,
গ্রাম ও পোঃ রামতাম,
লোহাগড়া,
নড়াইল।

১৬৪। মোঃ তাহিন মাহমুদ বেলাল,
পিতাঃ মোঃ বাহাউদ্দীন,
গ্রামঃ আশুগঞ্জ পূর্ব বাড়ী,
পোঃ কাকুলিয়া, কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৬৫। মোঃ মনসুরল হক জেহাদী,
পিতাঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব,
গ্রাম, পোয়াপাড়া,
পোঃ কলমপতি,
কাউখালী, রাঙামাটি।



একজন কিশোরী ও একটি কাশিনকল

উমে নামিম

রূপ সেনাদের শক্তিশালী, অত্যাধুনিক ও বিশালকার ট্যাংক বহর উচ্চ নিচু অসম পথ অতিক্রম করে বিজয়ী কাফেলার মত উন্নত শিরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। চলস্ত ট্যাংকগুলোর গভীর আওয়াজ ও সেনাদের ঘৃহৃহৃ জয়ধ্বনি পাহাড়গুলোকে কাঁপিয়ে তুলেছে। ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ীর ওপরে কাস্তে হাতুড়ে আঁকা লাল পতাকা পত্ত পত্ত করে উড়ছে।

তাদের এতটা নির্ভিক হওয়ার কারণ, তারা গোয়েন্দা সংস্থা 'খাদের' মাধ্যমে আগেই অবগত হয়েছে যে, এ এলাকাটি জনমানব শূন্য বিরাগ। কোন মনুষ্য এখানে নেই। এর কিছুদিন পূর্বে লাল পতাকা উড়িয়ে এখানে যারা এসেছিলো তাদের দৈন্তের মত ট্যাংকগুলো স্পন্দিত জীবনের কল কাক্ষীতে মুখের এই জনপদটিকে মাটি-টুর সাথে গুড়িয়ে দিয়ে ধূংসের ছলস্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে। উপরস্তু রাতো ঘাটের জীৰ্ণ দশা, বিধ্বন্ত ঘর বাড়ী ও ভূতুরে পরিবেশ এরই স্বাক্ষর বহন করছে।

অতএব যেখানে একটি শক্তি ও অবশিষ্ট নেই। প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার কোন আশংকাই যেখানে নেই, সে স্থান দিয়ে নির্ভিক চিন্তে চলতে বাঁধা কোথায়? কে ঠেকায় তাদের অগ্রায়াত্মা?

তারা উভাল তরঙ্গের মত মাতাল হয়ে উৎকঠাত্তীনভাবে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ভাবধানা এমন, তাদের অগ্রায়াত্মা কেউ রুখতে পারবে না।

কিন্তু জনমানব শূন্য মৌনতার নিরবতা ভেদ করে হঠাত সামনের পাহাড় থেকে বুলেটের আওয়াজ ভেসে এলো। তারা থমকে দাঢ়ালো, কোন পাহাড় থেকে বুলেট গুলো আসছে তা ঠাওর করতে পারছে না। তবে থর থর করে কাঁপছে। সবই অপ্রত্যাশিত, এমন

একটা পরিস্থিতির জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাপাত।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছট ফট করছে তরতাজা ক'রি প্রাণ। একটি বুলেটও ফাঁকা যায়নি। প্রতিটি বুলেট অব্যার্থ নিশানা হয়ে এক একটি বুক এফোড় ওফোড় করে অনতি দূরে লুকিয়ে গেলো। তাদের সাথে কেউ তামাশা করছে, না তারা মহাবিপদের সম্মুখীন তা বুঝে উঠতে পারছে না—সকলে কিংকর্তব্য বিমুড় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে বোকা রূপ বাহিনী কোন দিক নির্ণয় না করে বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ শুরু করলো। কেউ কেউ তড়ি ঘড়ি পঞ্জিশন নিল বৌপ বাড়ে-আড়লে আবড়ালে। বিরাট ট্যাংক বাহিনী তাদের কাপুরুষতা ঢাকার জন্য ভারি ভারি গোলার আঘাতে সামনের পাহাড়গুলোর উপর চরম প্রতিশোধ নিছে। তাদের নিষ্কেপিত ভারি ভারি সেলগুলো চারিদিকে জাহানামের দাহ সৃষ্টি করছে। বিরাগ জনপদটার যে দুচারটি ঘর বাড়ী ক্লান্তভাবে ধূংসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাও এবার জ্বলে ও ডেংগে ছার খার হয়ে গেল। তাদের বিষাক্ত সেলগুলো যেখানেই বিশ্বেরিত হয় সেখানেই সৃষ্টি হয় কুকুলি পাকানো আগুনের বিরাট বিরাট শিখা।

পাহাড়গুলো থেকে কোন বুলেট আর আসছে না। রূপ বাহিনী ভাবছে, হয় তো এতক্ষণে আক্রমণকারীরা নরকের দারে গিয়ে ঠেকেছে। তাদের শরীরের সবটুকু রক্ত এতক্ষণে এদেশের ত্রিস্তুতি রঙা মাটিরা চুষে চুষে খেয়ে ফেলেছে। যেমনভাবে রক্ত পান করে জংগলের নেকড়েরা।

এমনি সময় তাদের ভাবনার পর্দা হেঁস করে ডান দিকের পাহাড় থেকে এক ঝাক

গুলি এসে তাদেরকে আলিঙ্গন করলো। আলিঙ্গনবন্ধ বুলেটগুলোর যন্ত্রণায় কয়েকজন নওজোয়ান পায়াগ পাহাড়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল।

থেমে থেমে চোরা গোঁড়া আক্রমণ রূপ বাহিনীকে অস্তির করে তুলছে। দোর্দু রূপবাহিনী এবার চরম অসহায়ত্ব বোধ করছে। কত দিক থেকে কত শতজনে আক্রমণ করছে তা এখনো বুঝতে পারছে না। তাই পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু পালাবে কোথায়, মনে হচ্ছে যেন তিনি দিকের পাহাড়গুলোর চূড়ায় চূড়ায় অসংখ্য মুজাহিদ মর্টার তাক করে বসে আছে। পালাবার পথও রক্ষা। বেঁচে থাকার একমাত্র পথ ট্যাংকের গোলাদারা পাহাড় গুলোকে মাটির সাথে মিসিয়ে সামনে ময়দান তৈরী করা। তাই একের পর এক আঘাত, ভারী ভারী অঙ্গের আঘাত। কিন্তু একটি পাহাড়ও ভাঁগছে না। সামনে বাড়তে পারছে না। এদিকে শাশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রক্তে রঞ্জিত অসংখ্য লাল সৈন্য জনমের মত ঘূরিয়ে গেছে।

নিজ সেনাদের শাশের বহর দেখে ভীত সন্ত্রিত কমান্ডার একটু সাহস সঞ্চয় করে নির্দেশ দিল, সামনে বাড়ো! এমনি মুহূর্তে ওদিকের পাহাড় থেকে একবাক বুলেট এসে অগ্রগামী বাহিনীর বুকগুলো বাঘরা করে দিল। কমান্ডার মৃত্যু অনিবার্য ভেবে সৈন্যদেরকে সামনে বাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চিংকার দিয়ে বললো, সামনে বাড়ো!

ঠিক এই মুহূর্তে গর্জে উঠলো আর একটি পাহাড়। লুটিয়ে পড়লো কয়েক ডজন রূপ সেনা। তারা আহ উহ করছে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তারই কোলে ঢলে পড়ছে। রক্তের বন্যায় চুতাদিক তেসে যাচ্ছে। নেপত্যের আক্রমণটা এবার যুৎসই হয়েছে।

সেনাদের অগ্রগামী লাইন ভেঙ্গে গেছে। বাকী যারা বেঁচে আছে তারা হতাশা ও উৎকষ্টার গহীন সাগরে হাবু দুবু থাছে। লাল পতাকাবাহী তথাকথিত বিপ্লবীরা এবার তাদের রাঙ্গা রক্তে ভেঙ্গার মত ভাসছে।

মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যারা তামাশায় মেঠে উঠে, মুসলমানদের রক্ত দিয়ে যারা জিঘাংসা চরিতার্থ করে, মুসলমানের রক্ত যাদের কাছে পানির মূল্যও রাখে না, আজ প্রকৃতি তাদেরকে উপহাস করে হাসছে আর বলছে, প্রতিশোধ, এরই নাম যথার্থ প্রতিশোধ।

এখনও ওরা নির্ণয় করতে পারে নি যে, বুলেটগুলো ঠিক কোন দিক থেকে আসছে এবং আক্রমণকারীরা সংজ্ঞায় কতজন হতে পারে, আক্রমণের তেজ ধারা তাদেরকে এসব ভাববাই অব্কাশ দিচ্ছে না।

ত্বুও ব্যার্থতা ঢাকার ব্যার্থ কসরত। ট্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যান্বীন অগ্নিবর্ষন। তন্ত্রজু-নিরব পাহাড়িকার গায়ে উপর্যুপরি আঘাত। পাহাড়গুলো থর থর করে কেপে উঠছে। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে অবিরাম গোলা বর্ষণ করবে। ত্বুও ব্যার্থতা ঢাকতে হবে। যেদিক ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা, কামান দাগাও, সব কিছু ধ্বনি হয়ে যাক। একটি প্রাণীও বেঁচে না থাকুক তাতে এতটুকু দুঃখবোধ জাগবে না। কেননা এদেশে তারা মানবতার ডাকে আসেনি, তারা এসেছে এশিয়ার এই হৃদপিণ্ডটাকে দখল করতে—চায় শুধু দখলদারিত। এদেশের ধন-সম্পদ ও জন-সম্পদ বাঁচলো কি মরলো তাদের তো সেদিকে তাকাবার কথা নয়? সোজা কথায় তারা মানুষ চায় না মাটি চায়।

কমান্ডার বহু কষ্ট করে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলো। একটু সামনে আগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাহসের অভাবে ব্যার্থ হলো। বার বার সামনে আগাবার চেষ্টা করে বারবার ব্যার্থ হলো। অগঙ্গিত লাশ তাদের পথ ঝোখ করে দাঢ়ায়।

আঘাতের পর আঘাত থেয়ে কমান্ডারের হশ এলো। জীবিত সেনাদেরকে হালকা অন্ত নিয়ে পাহাড়ে ওঠার আদেশ করল। আর ট্যাংক বাহিনীকে যে কোন হামলা প্রতিহত করার জন্য হশিয়ার থাকার পরামর্শ দিল।

গেরিলা সেনারা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে আক্রমণকারীদেরকে কুকুরের মত তেজ অন্তুভুতি নিয়ে হস্ত দস্ত করে খুঁজতে লাগল। কি আচর্ষ, কোথাও একটি মানুষের গঁজ নেই। বদমায়েশরা গেল কোথায়? মাটিতে সীন হয়ে গেছে, না হাওয়ায় উরে গেছে, সবগুলোতো এভাবে বেঁচে যাবার কথা নয়। সহস্র গোলার আঘাতে কমপক্ষে দু'চারটি লাশ পড়ে থাকাই ছিল ব্যক্তিক।

প্রতিপক্ষের গোলা থেমে গেছে। অনেকগ যাবৎ কোন বুলেট ইসলামের শক্রতায় ভরা এই ফেরাউনী বাহিনীর বুকে এসে বিধুতে না। তাই কুকুরীর কালিয়ায় লেপা বুকগুলোয় সামান্য সাহসের সংক্ষাৰ হয়েছে। যে হৃদয়গুলো ইসলামের সাথে চির শক্রতায় চৃষ্টিবন্ধ সেই হৃদয়গুলো আবায় শক্রতার দাহতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। চরম প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপ্ততা নিয়ে তারা আক্রমণকারীদেরকে খুঁজতে পাহাড়গুলো ভর ভর করে চৰে বেড়াচ্ছে। ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হঠাৎ ওরা ধমকে দাঢ়ালো। মৃত্যুর আশংকায় ওদের হৃদয়গুলো থর থর করে কেপে উঠল। ছোট ছোট চৰচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সামনে রক্তের লাল লাল ছাপ। ওই যে এটা লাশ। ক্রোধে ফেটে পড়লো ওরা। বেয়ানেট বের করে প্রাণহীন ঘাতকের বুকের মাঝখানে বসিয়ে দেবার ইচ্ছা করলো। কিন্তু একি, এ যে এক কিশোরী। জনমানবহীন এই জনপদটায় কেন এসে ছিলো কুসুমের মত এই যেয়েটি? ওদের মনের কোনে অজ্ঞাতে একটু সহনভূতি জেগে উঠলো।

কেউ বিখ্যাস করতে পারছে না, ন'বহুরের ছোট একটি মেয়ে আর তার হাতে

একটি ক্লাশিনকৃত। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত তার। বুকে বুলেটের আঘাত। আশ পাশের কোথাও কোন মুজাহিদের সঙ্গান পাওয়া গেল না। তবে কি আমরা এতক্ষণ একজন কিশোরীর সাথে মুকাবিলা করেছি? সজ্জা এত সজ্জা সূক্ষ্মাবার আয়গা পৃথিবীতে কোথায়।

অন্তে শব্দে সজ্জিত বিশাল ট্যাংক বাহিনীকে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ঠেকিয়ে রেখেছিল একা কিশোরী একটি ক্লাশিনকৃত দিয়ে। আর নিচিং ধ্বনিসের মুখে ঠেলে দিয়েছে রশ্মি সেনাদের একাংশকে। বিরাঙ্গণ কিশোরী আফগানী বলেই এমনটা দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে।

এই কিশোরী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় ও মাতা-পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অত্যন্ত ভূমিকা সেই দিন থেকে পাহাড়ে এসে উঠেছে যেনিদ রশ্মি বাহিনীর পাবাগ হৃদয় সেনারা তার পিতা-মাতা-আত্মীয় বজ্জনকে নির্মম তাবে হত্যা করেছে এবং মাথা শুজার ঠাই প্রিয় ঘরটিকে যে দিন তারা আগুন দিয়ে ছালিয়ে দিয়েছে।

কিশোরী অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। কখন আসবে প্রতিশোধ গ্রহণের সুভক্ষণ। যারা আমার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছে, যারা আমার মাতা শুজার ঠাই ঘরটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে, যারা আমার ফলের বাগান নষ্ট করেছে, যারা আমার প্রিয় মাতৃভূমি দখল করে নিয়েছে—আমার ক্লাশিনকৃতা দিয়ে তাদের একজনকে হলেও আমি হত্যা করব। বদলা আমি নিবাই জীবনের বিনিময়ে হলেও।

সুযোগ আসলো। মেয়েটি তার ক্লাশিনকৃতটা দিয়ে থেমে থেমে তিনিদিকের পাহাড় থেকে আক্রমণ রচনা করে বিশাল বাহিনীকে ধ্বনিসের মুখে ঠেলে দিল। পিতা মাতা হত্যার প্রতিশোধ সুন্দে আসলে গ্রহণ করলো। শেব আকাংশা শাহাদাতের সুধা পান করার সৌভাগ্যও তার ঘটলো। সহযোগিত করলো বীরতৃণ্যাধীন পাতায় (৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা

শাইখুল হাদিস মাওঃ আজিজুল হক
সাহেবের ঐতিহাসিক মুক্তি লাভ

অবশ্যে সত্ত্বের জয় হল, আরো একবার ইসলামের বিজয় হল। বাংলাদেশের মর্দে মুজাহিদ লং মার্ট নেতা শাইখুল হাদিস জনাব মাওঃ আজিজুল হক সাহেবের কারা-মুক্তি এক ঐতিহাসিক ঘটনার সৃষ্টি করল। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশ্মন আর্য ব্রাহ্মণদের বিরোধীতা ও তাদের নাপাক তৎপরতার প্রতিবাদ করার কারণে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সার্ক স্মেলনের সময়। কেননা এই বাংলাদেশে বসে এই মর্দে মুজাহিদ যে হায়দারী হস্তার হেড়েছিলেন তাতেই ছিলীর তখতে তাউমে উপরিটি নরসীমা রাওজীর অস্তরাত্বা শুকিয়ে মরম্বৃত্যিতে পরিণত হয়েছিল। এরপরও যদি রাওজীর ঢাকা আগমনের পরও এই মর্দে মুজাহিদকে স্বাধীন তাবে বিচরণ করতে দেয়া হত তাহলে হয়ত রাওজী যে কোন মুহূর্তে হাটের ব্রেক ফেল করতেন। সুতরাং রাওজীর চিত্তে শাস্তি দেয়ার জন্য সরকার তার শুভাগমনের (!) পূর্বেই জনাব আজিজুল হক সাহেবকে বল্পী করে তার আশংকা দ্রু করেন।

ভারতের তোয়াজ করতে গিয়ে এদেশের মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে কারাবন্দে করার গহিত তৎপরতা এদেশের মানুষ সুন্দরে দেখেনি। তারা তাদের নেতাকে মুক্তির জন্য আর একটা লং মার্ট করার বাপক প্রস্তুতি নিছিল। অবশ্যে সরকারের উন্নত নড়ে। তারা মাওঃ আজিজুল হক সাহেবকে মুক্তি দেয়ার যে কোন একটা ইস্যু খুঁজছিল এবং পেয়েও গেল। মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের প্রাণপ্রিয় উত্তাদের এ কারা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না। তারা বিশ্বুক হয়ে কিতাব নিয়ে হাজির হয় ঢাকা সেক্রেল জেনের গেটে। তাদের জেল পুলিশের নিকট একটাই দাবীছিল, “হয় আমাদের উত্তাদকে মুক্তি দাও, নতুন বুখারী শরীফ পঢ়াও।”

ব্যাস, এতটুই যথেষ্ট। বাংলাদেশের

ইতিহাসের সকল বেকর্ত ভজ করে সরকার চলছে। নিরাপত্তা বাহিনীর এ অবিচারের জন্য মাত্র আধা ঘটার মধ্যে শাইখুল হাদিস তারা খুবই ক্ষুক এবং মুজাহিদদের সঙ্গে মাওঃ আজিজুল হক সাহেবকে মুক্তি দেয়। যা’ ছিল এক অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

সরকারের এ ব্যাপক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণিত হল সত্ত্বের জয় অবশ্যাবী।

কাশীরের মুজাহিদদের হাতে একটি থানার পতন

গত ১৪ই মে একে-৪৭ ও ৭৪ এ্যসন্ট রাইফেল সজ্জিত কাশীরী মুজাহিদরা গভীররাতে পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত কাশীরের একটি থানায় হামলা চালিয়ে সেটি দখল করে নেয়। ডিলাগাম নামের এই থানায় অভিযানের সময় কোন পক্ষের কেউ হতাহত হয়নি। মুজাহিদরা থানার কল পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। পরে তারা ২০টি রাইফেল ও হাজার হাজার রাউড গোলাবারণ নিয়ে সট্টেকে পড়ে।

কাশীরী পুলিশরাও অবশ্যে
স্বাধীনতার দাবী জানালো

ভারতের সেনাবাহিনীর দুর্ব্যবহারে অভিষ্ঠ হয়ে অবশ্যে কাশীরের মুসলমান পুলিশরাও স্বাধীনতার দাবীতে সোচার ছয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর হেফাজতে একজন মুসলিম পুলিশের মৃত্যুর পর তারা এই দাবীতে সোচার হয়েছে। উক্ত পুলিশকে মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভারতীয় বাহিনী কাশীরী পুলিশদের সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। এজন্য তাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় না। সহকর্মীরা মৃত্যুর জন্য দায়ির বিচার চেয়ে কাশীরী পুলিশরা এক ব্যাপক ধর্মঘটে অংশ নেয়। অবশ্যে ১৫ দিন পর কমাণ্ডো সৈন্যদের হস্তক্ষেপে তাদের নিরন্তর করা হয় এবং ধর্মঘটের অবসান হয়। এ ঘটনার পর মূলত তখনই ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয়ে যায়। পুলিশকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এর চলতি মাসে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আরও বহুজনকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া দেশটির জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ১৯৪০

সারাজোভোয় পৌচ্জন নিহত

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গ্রীষের এথেল নগরীতে শাস্তি আলোচনা চলাকালিন বসনীয় সার্বদের প্রচণ্ড মার্টার হামলায় পৌচ্জন মুসলিম নিহত হয়েছে। বসনীয় সার্বনেতা এই বৈঠকে শাস্তি চুক্তিতে সই দেয়ার মাত্র ৫ ঘটার ব্যবধানে এই ঘটনা ঘটে। এটা ছিল মুসলমানদের প্রতি সার্বদের শাস্তির আধুনিক তোহফা।

বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যন্তর ঘটল
আরেকটি মুসলিম দেশের

বিশ্ব মানচিত্রের বুকে নয়া একটি মুসলিম দেশের অবয়ব ফুটে উঠেছে। ইসলামী ঐতিহ্যে ভরপুর লোহিত সাগরের কোল যেমে আফ্রিকার শৃঙ্গে জন্য নিয়েছে নতুন মুসলিম দেশ ইরিত্রিয়া। ত্রিশটি বছর ধরে সংযোগের পর ৬০ হাজা মুজাহিদের রাজ্ঞের বিনিয়মে জন্য নিয়েছে এই দেশের। প্রায় ৪০০ বছর তুকী উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার পর এ দেশটি ১৮৬৪ সালে ইতালী দখল করে নেয় এবং এ দখল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতালির বিদায় নেয়ার পর জাতিসংঘ দেশটির জন্মত উপেক্ষা করে পার্শ্ববর্তী ইথিওপিয়ার ম্যান্ডেটরী শাসনে অর্পন করে। সক্রিয় কারণেই মুসলমানরা তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে ইথিওপিয়া একসময় ইরিত্রিয়াকে গ্রাস করে নেয়। ফলে মুসলমানদের প্রতিরোধ আলোচনও তীব্র হয়। দীর্ঘ দিনের আলোচন শেষে ১৯৯০ সালে কমুনিষ্ট হাইলে মরিয়ম মেসেন্টুর বাহিনী ইরিত্রিয়া থেকে বিভাড়িত হয়। মূলত তখনই ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয়ে যায়।

সমর্থন প্রকাশ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পর বিশ্বের অনেক দেশ তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। স্বীকৃতিদাতাদের মধ্যে ইঞ্জিওপিয়াও অন্যতম।

বসনীয় মুসলিম বাহিনীর পান্টা আক্রমণ

বসনীয়ার মুসলিম বাহিনী দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মোস্তারে আক্রমণকারী ক্রোকবাহিনীর বিরুদ্ধে পান্টা আক্রমণ চালিয়েছে। ক্রোক বাহিনী গত এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ বিরতি চৃত্তি লংঘন করে এই মুসলিম শহরটি দখল করে নেয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। উল্লেখ ক্রোট ও মুসলিম বাহিনী সার্বদের বিরুদ্ধে একটি মৈত্রী চৃত্তি সম্পাদন করলেও সম্প্রতিক সময়ে বসনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভগাভাগি করে নেয়ার জন্য সার্ব ও ক্রোকদের মধ্যে একটি গোপন সময়ে হওয়ার কারণে সে মৈত্রী চৃত্তি তেক্ষে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এদিকে জাতিসংঘের একত্রফা অন্ত নিষেধাজ্ঞার ফলে গোলা বারুদের অভাবে মুসলিম বাহিনী এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়েছে। বসনীয় শহর সেক্রেনিয়ার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর কাছে ১৫ হাজার অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকলেও এই নিষেধাজ্ঞার কারণে মুসলমানরা গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে না পরায় সম্প্রতি সেক্রেনিকা শহরের পতন ঘটে। একই কারণে জেপা শহরে ও পতন হয়। বসনিয়া কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে বাই বাই দাবী করছে যে, তাদের দেশের ওপর থেকে অন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে তারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সভ্যতা গবী পাশাত্য ও জাতিসংঘ তাদের এ আহবানে অজ্ঞাত কারণে সারা দিচ্ছে না।

আবখাজিয়া বাহিনীর হামলায় ৭ জন জঙ্গীয় সৈন্য নিহত

সম্প্রতি আবখাজিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলিম গেরিলাদের এক হামলায় ৭ জন জঙ্গীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৪ জন। সৈন্যরা যখন একজন নিহত সৈন্যের আস্তেটিক্রিয়া অনুষ্ঠান চালাচ্ছিল

তখন গেরিলারা মট্টোর হামলা চালালে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ, গত আগস্ট মাসে আবখাজ পার্লামেন্ট জঙ্গীয়া থেকে আবখাজিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জঙ্গীয়ার সাথে আবখাজিয়ার গেরিলা বাহিনীর লড়াইয়ের সূচনা হয় এবং এ পর্যন্ত সহিংসতায় কয়েক হাজার লোক নিহত হয়েছে।

সতেরজন ভারতীয় সৈন্য হত্যার পর শাহাদাত লাভ

শ্রীনগর “হরকাতুল জিহাদ আপ ইসলামীর” মুজাহিদ মাওলানা দোষ্ট আলী ১৭ই রম্যান কাশীরের বারামুলাহ শহরে ইঞ্জিয়ান সৈন্যদের সাথে এক কৃতিপূর্ণ অসম লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

কাশীর থেকে হাফেজ আকরাম উল্লাহর পাঠানো এক বিবরণে জানা যায় মাওলানা দোষ্ট আলী (চৌধুরী গিয়াস নামে পরিচিত) বদর দিবসে দুশ্মনদের ওপর এক আক্রমণের প্রস্তুতি নিছিলেন। এমন সময় গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে ভারতীয় সৈন্যরা এলাকায় সান্ধ আইন জারি করে। তল্লাপির জন্য বাড়ীর চারাদিক ঘিরে ফেলে। সেই সময় মাওলানা দোষ্ট আলী ও মোহাম্মাদ সাবের সহ মোট আটজন মুজাহিদ একটি গোপন ব্যাংকারে আশ্রয় নেয়। সৈন্যরা তল্লাপী করে তাদের বের করতে সক্ষম না হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু গুপ্তচর তাদেরকে দৃঢ়তর সাথে মুজাহিদ থাকার কথা বলে। এর পর সৈন্যরা একটি দেওয়াল তেক্ষে ব্যাংকারের সন্ধান পায়। ব্যাংকারের বাইর থেকে চারজন মুজাহিদের নাম ধরে ডাকতে থাকে। এরা আল জিহাদ নামক সংগঠনের সদস্য। তারা এই তেবে বাইরে আসে যে, এতে বাকী চারজন বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু তাদের বের হবার পর অপর দুজনের নাম ডাকতে থেকে। তারাও বের হয়ে আত্ম সমাপ্ত করে। এর পর গুপ্তচর থেকে সংবাদ নিয়ে সৈন্যরা বাদুবকী দুজন মুজাহিদের নাম ডাকা শুরু করে। দুশ্মনের হাতে ধরা না দিয়ে লড়াই করে শাহাদাত লাভকে শ্রেষ্ঠ মনে করে মুজাহিদ দোষ্ট আলী ক্লাসিনকৃত নিয়ে বাইরে এসে এক ব্রাশে আটজন সৈন্য ঘায়েল করে।

এর পর গেটের বাইরে দাঢ়ানো আরও দুজন সৈন্যকে হত্যা করে ঘরের তিন তলায় চলে যায়। মুহাম্মদ সাবের তার পরে বের হয়ে ঘরের মধ্যে আহত সৈন্যদের হত্যা করে উপরে চলে আসে। এরা দুজন সাড়ে তিন ষষ্ঠী পর্যন্ত দুশ্মনদের মোকাবেলা করে। এর পর গুলি শেষ হলে নিহত সৈনিকদের থেকে ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি আনার জন্য দোষ্ট আলী ক্লোলিং করে নিচে মেনে আসে। এই সময় দুশ্মনদের থেকে এক ব্যাক গুলি এসে দোষ্ট আলীর মাথা ও বুকে বিন্দ হয়। প্রাথমিক খবরে ভারতীয় সৈন্য সৈন্যদের নিহত ও আঠারোজন আহত হয় বলে জানা যায়। পরে আহতদের মধ্য হতেও এগারো জন হাসপাতালে মারা যায়। অসম সাহসী মুজাহিদ কমান্ডার দোষ্ট আলী একুশেন সৈন্যকে নিহত ও পাঁচজনকে আহত করে শাহাদাত লাভ করেন।

এই আকর্ষিক আক্রমণে সৈন্যরা এত ভীত হয় যে, সুবেদার তাদেরকে শহীদ দেওও আলীর অস্ত্র আনতে আদেশ করলে তারা লাশের সামনে যেতে ভয় পায়। একজন সিতিলিয়ানের সাহায্যে তারা তার অস্ত্র তুলে কোনক্রমে নিহত সৈন্যদের সাথে নিয়ে চলে যায়। অপরদিকে মুজাহিদ মুহাম্মদ সাবের সৈন্যরা চলে গেলে নিরাপদে ঘাঁটিতে পৌছে এই সংবাদ জানায়।

গ্রন্থনামঃ ফারুক হোসাইন খান

একজন কিশোরী

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

একটি বর্ণনী অধ্যায়। আর ইসলামের শক্তি সম্প্রসারণবাদী ও সম্প্রাঞ্জিবাদীদের জানিয়ে দিল, মায়া'য ও মুআ'যের বোনেরা এখনো বেঁচে আছে। এখনও মুসলমানের ঘরে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তারিক ইবনে যিয়াদের ক্লহানী মেয়েরা জীবিত আছে। দীনের জন্য জীবনকে উৎসর্গিত করার মত মেয়েদের এখনও অভাব নেই। কেমন না এদের ধর্মনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, দিখিবিজয়ী মুসলিম সেনাদের তঙ্গলহ। যাদের ইতিহাস গর্বিত ইতিহাস, যাদের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস। যারা পরাধীনতাকে কখনও মেনে নেয় না এবং পরাজয়কে কখনও গ্রহণ করে না।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক



চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ

২৩ যদুনাথ বসাক লেন (টিপ্প সুলতান রোড), ঢাকা হতে মর্দিত।